প্রাক-কথন: প্রধান লেখক ও সম্পাদক
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

"শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" – এই শিরোনামের মধ্যে নিহিত রয়েছে গবেষণামুলক এই গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থের সূচনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি স্মরণ করছি: "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে; আমি বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে"। যদিও কবিতা ও কলিটির ভাব ভিন্ন। তথাপি শব্দগুলোর চয়ন আরেকটি ভাব আমাদের মধ্যে জাগ্রত করছে যা আমাদের গ্রন্থটির জন্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি। আভিধানিক অর্থে: "শ্রীমন্ত" হচ্ছে "সৌভাগ্যবান বা সম্পত্তিশালী" এবং "বাট" হচ্ছে "পথ বা রাস্তা"।

অতএব "শ্রীমন্ত" নদীটি বড়োই ভাগ্যবান ও সম্পত্তিশালী। শ্রীমন্ত "বাট" বা পথ ধরে ২৬০ বছরেরও অধিক বছর পূর্বে পর্তুগীজ বনিকদের আনাগোনা ছিল। এই পথ বেয়ে আদি খ্রিস্টান বাসিন্দারা এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা শিবপুরে এসেছিলেন। এই শ্রীমন্ত-বাটে কত নৌকা আর বিখ্যাত সেই জলযান "গয়না-তরী" যুগ যুগ ধরে শ্রীমন্ত ঘাটে "আনাগোনা" করেছে এবং চলেছে মানুষের যোগাযোগ ও পথচলা। এখানে হয়েছে অনেক "বেচা কেনা", "লেনা দেনা"! এই অববাহিকার অতীত ইতিহাসের স্রোতধারা এবং তরীবাট বয়ে নিয়ে এসেছে অনেক মানুষ, তাকে ঘিরে সৃস্টি হয়েছে মানুষ ও তার ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মিলনমোহনা; প্রবাহিত হয়েছে মানুষের মধ্যে অনেক উন্নয়নধারা। অসংখ্য মানুষ রেখে গেছে তাদের "পায়ের চিহ্ন এই বাটে"। তাই "শ্রীমন্ত" বড়োই সৌভাগ্যবান এবং বড়োই সম্পত্তিশালী। "শ্রীমন্ত-বাটে" ও "শ্রীমন্ত নদী"র তীরে গড়ে উঠেছে "শিবপুর" গ্রামে ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিষ্টান জনপদ। কালে ও কালান্তরের একদিন এই খ্রিস্টীয় জনপদ নাম ধারণ করেছে "পাদ্রীশিবপুর"। ঐতিহ্যবাহী পাদ্রীশিবপুর তার ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত, ভাষা ও সংস্কৃতিগত, শৈল্পিক স্থাপত্য ও মানবসেবার ঔজ্জ্বল্য এবং মানবোন্নয়নের নিদর্শন হয়ে মাথা উঁচু করে যুগ-যুগান্তরে দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্তা ও সমৃদ্ধিতে।[১]

প্রেরণা ও ধারণার কথন

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের একটি শুভদিনে, প্রার্থনা-গৃহে বসে, জীবনের আশিতম বর্ষপূর্তির অপেক্ষায় প্রার্থনায় যখন মগ্ন ছিলাম তখন মনে একটি ধ্যান আসল: যে মৃত্তিকায় আমার জন্ম হয়েছিল সেই "পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া"র ধর্মপল্লীর মাতৃ-গর্ভে জীবনের সায়াহ্নে চিরতরে যদি শায়িত হতে বাসনা করি, তাহলে আমার জীবনের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ "ধর্মপল্লীর জীবন-চরিত" ভাবনায় একটি পুস্তক রচনা হয়তো ক্ষুদ্র একটি অবদানের নিদর্শন হয়ে থাকবে। এই বিষয়টি যতোই ভাবতে লাগলাম ততই বাসনাটি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল এবং স্বপ্নটি আরও স্বচ্ছ ও সম্ভাব্য বলে প্রতিভাত হল।

প্রথমেই আমার ভ্রাতস্পুত্র যাসেফ ডি'রোজারিও-র সাথে এই বিষয়টি নিয়ে ফোনে আলাপ করলাম। উত্তম চিন্তা বলে সায় দিল। কার্ডিনালের "জীবন-চরিত" প্রকাশনায় আমাদের দু'জনার অতীত অভিজ্ঞতাকে পূঁজি ক'রে, ভবিষ্যৎ কাজে পা বাড়ানোর সাহস আমরা উভয়েই পেলাম। পরবর্তীতে পরিকল্পিত গ্রন্থটি সম্বন্ধে একটি "ধারণাপত্র" রচনা করে কার্ডিনাল পরম্পরার কোর কমিটির সাথে শেয়ার করলাম। এই প্রস্তাবে সবাই উৎসাহী হয়ে আন্তরিক সমর্থন জানাল এবং আপন আপন জায়গা থেকে সকলেই সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিল। কার্ডিনাল পরম্পরার কোর টিমের সদস্যরা হচ্ছেন: যোসেফ ডি'রোজারিও, শ্যামল লরেন্স গোমেজ, জেমস গোমেজ, রীনা যোয়ান্না ডি'রোজারিও, বার্নাড পংকজ ডি'রোজারিও, ইভন ছিলু ডি'রোজারিও। পাদ্রীশিবপুরে সরেজমিনে সকল কাজে সহায়তা করার জন্য নেওয়া হল অমল গোমেজ এবং রনি ডি'রোজারিও-কে।

---

১ "বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস" পুস্তকে বলা হয়েছে যে: "শ্রীমন্তপুর খালকে শিবপুর খালও বলা হয়। এই খাল বাকরগঞ্জ ও শিবপুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত", পৃ: ৩৮৭।

প্রথম "ধারণাপত্র"-এ গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, সম্পাদনা কমিটির দায়িত্ব এবং ৬টি অধ্যায় সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তুত করেছিলাম। যাত্রাকালে পরবর্তীতে প্রয়োজনের খাতিরে ৬টি অধ্যায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে গোটা গ্রন্থকে ১৩টি ভাগে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি ভাগে একাধিক অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করে গ্রন্থটির পরিকল্পনা করা হল। সেই সঙ্গে সকল কাজের সময়-সীমা বেধে দেওয়া হল যাতে পরিকল্পনা মাফিক এই বিশাল কাজটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত ক'রে প্রকাশ করা যায়। সময়-সীমার লক্ষ্য ছিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। তার কারণ পাদ্রশিবপুরের সূচনা ও প্রথম গির্জা স্থাপনের ২৬০ বছরের পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের মধ্যে প্রকাশ করা।

গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য

যে-কোন প্রকল্পের কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যগুলো প্রকল্পের লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট রাখে, গতিকে চলমান করে এবং কর্মসকল ফলপ্রসূ করে। পরবর্তীতে নির্ধারিত উদ্দেশ্যই মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়ে থাকে। আমরাও আমাদের গ্রন্থ-রচনার জন্য তিনটি মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত করেছি। এই উদ্দেশ্য সম্পাদন করাই ছিল আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য দ্বারাই মূল্যায়ন করা হবে আমাদের এই প্রচেষ্টা। তবে এ কাজে কতটুকু আমরা সফল হয়েছি তা মূল্যায়ন করবে পাঠকবর্গ ও উপকারভোগীরা।

(১) পাদ্রীশিবপুরের অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সম্পর্কে পুস্তক রচনা

এই প্রথম উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এই গ্রন্থে রচিত হয়েছে পাদ্রীশিবপুরের একটা ইতিহাস যার বিস্তৃতি বিরাজিত অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। প্রেক্ষাপট রূপ আলোচিত হয়েছে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ ও বরিশালের সম্যক পরিচিতি। এখানে রয়েছে খ্রিস্টান জনপদের গোড়াপত্তনের কথা, খ্রিস্টান জনপদের ক্রমবিবর্তনের ধারা, এবং পাদ্রীশিবপুর অধিবাসী ও অভিবাসীদের চিত্র, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা। কেবলমাত্র অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের অবস্থার মধ্যে সীমিত না থেকে আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভবিষ্যত প্রত্যাশার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

পাদ্রীশিবপুর ঐতিহ্যবাহী ধর্মপল্লী বটে; তবে শুধু নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় মণ্ডলী হিসেবে আমাদের রয়েছে একটি মিশন-দায়িত্ব। অনেক সময় আমাদের অজান্তে বা সমসাময়িক কালে নিশ্চিন্তায় অনেক কিছু অর্জন হয়েছে যা সৃষ্টি করে গেছে যুগে যুগে ধর্মপল্লীর অবদান। এই অবদান বহুরূপী, বহুমাত্রিক এবং বহুবিস্তৃত। তাই আমরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সেই সমস্ত অবদান যা খ্রিস্টান জনপদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, সেই সমস্ত অবদান যা বৃহত্তর সমাজ ও দেশের মঙ্গল নিয়ে এসেছে এবং সেই সমস্ত অবদান যা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছে সমৃদ্ধ। এই আলোচনাও আমাদের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

(২) পাদ্রীশিবপুরের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে তা সংরক্ষণ করা

যাকিছু কালের অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে তা যতদূর পারা যায় পুনরুদ্ধার করা এবং তা সংরক্ষিত করে রাখা ছিল আমাদের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য। সবকিছু পাওয়া যাবে না, উদ্ধার করাও হবেনা, আর সবকিছুর সংরক্ষণ – তা তো অসম্ভব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গবেষণা করেছি পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠির জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়, তাদের ভাষা ও সঙ্গীত, তাদের বসতবাড়ি, ভূ-সম্পত্তি ও জীবনধারা; আলোচনা করা হয়েছে তাদের কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় জীবন এবং তাদের জীবনাচরণ। এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে ধর্মপল্লীর অতীত ও বর্তমানের সেবাকর্ম, নিজস্ব সমাজমুখী ও বৃহত্তর সমাজমুখী সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাকর্মীদের পরিচয় – প্রয়াত ও জীবিতদের চিন্তাধারা. কর্মকীর্তি ও অবদান। সংগ্রহ ও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে কিছু অতীতের ছবি, লিপিফলক, ব্যবহারিক দ্রব্য-সামগ্রী যা নিদর্শন হয়ে থাকবে যুগ-যুগান্তরে। ইতিহাস উদঘাটনের উদ্দেশ্যে, প্রয়াত বেশ কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিদের লেখা, জীবন-কাহিনী ও তাদের অবদান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিশেষে উদাহরণ স্বরূপ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি বংশ-তালিকা উল্লেখ করে পরিবার-পরম্পরার ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে অভিবাসন-প্রবণ বিশ্বে অন্যেরাও যেন একই কাজে অনুপ্রাণিত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াস ছিল, যা প্রায় হারিয়ে গেছে তাকে আবার উদ্ধার করা, যা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় তা ধরে রাখা এবং তা সংরক্ষণ করা। চেষ্টা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য; কিন্তু কতটুকু তা সফল হয়েছে তার বিচার পাঠকদের হাতে।

(৩) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেকড়ের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করা।

আমরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত নই, আমাদের আছে প্রজন্ম, প্রজন্মান্তরের প্রজন্ম। তারা আমাদেরকে কীভাবে দেখে? আমাদের সম্বন্ধে তারা কী বলে? আমরা কীভাবে তাদেরকে দেখি, আমরা তাদের জন্য কী রেখে যাব? তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কী? এই সব বিষয়গুলো আমাদের আলোচনায় স্বল্পাকারে হলেও স্থান পেয়েছে। শূন্য থেকে কেউ আসেনি, আমরা পরিবার-পরম্পরা, আমাদের একটা শেকড় আছে। আমরা ব্যক্তি মাত্র নাই, আমরা সমাজ, মিলন-সমাজ। অতএব এই গ্রন্থে আমাদের সকল আলোচনার মধ্যে এই ভাবটি ছিল আমাদের অতীতের ইতিহাস, আমাদের জীবনধারা, আমাদের মূল্যবোধ, প্রভৃতি প্রজন্মান্তরে প্রজন্মের মধ্যে বা আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে একটি গর্ব, ঐক্য, পাদ্রীশিবপুরজাত বা বংশোদ্ভূতদের মধ্যে একটা মিলন ও যোগাযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা ভাসমান কোন জনপদ নই; আমাদের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চলমান মূল্যবোধ।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আমাদের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নোক্ত দ্বাদশটি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছি:

প্রথম ভাগ ঃ	প্রেক্ষাপট: বাকেরগঞ্জ/বরিশাল জেলা, বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়ন
দ্বিতীয় ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ইতিহাস অবকাঠামো ও ক্রমবিবর্তন
তৃতীয় ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের অধিবাসী ও অভিবাসী
PART FOUR:	EXTERNAL MIGRATION OF THE PADRISHIBPURIANS
পঞ্চম ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
ষষ্ঠ ভাগ :	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীত ও বর্তমানের সেবাপ্রতিষ্ঠান
সপ্তম ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান
অষ্টম ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: বিশপ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী: অতীত ও বর্তমান
নবম ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: অতীতের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার, প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তিত্ব, অ্যালবাম ও রচনা
দশম ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: স্থানীয় সমাজ, দেশ ও মণ্ডলীতে অবদান
একাদশ ভাগ:	পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ: উপসংহার ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা
দ্বাদশ ভাগ:	সংগৃহীত পরিসংখ্যান ও দলীয় আলোচনার ফলাফল ও তথ্যপ্রদানকারী
ত্রয়োদশ ভাগ:	পরিশিষ্ট: সংকলিত তথ্য:
	পরিশিষ্ট -১: "রামুর পালা" – পুস্তক
	পরিশিষ্ট -২: বংশ-তালিকা
	পরিশিষ্ট -৩: গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

গ্রন্থ-রচনার কর্মপদ্ধতি

১) লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা:

- প্রথমেই আমাদের কাজ ছিল যা-কিছু লিখিত ইতিহাস বা তথ্য আছে তা সংগ্রহ করা। এই কাজটি প্রথম দিন থেকে গ্রন্থরচনার সমাপ্তি পর্যন্ত চলমান ছিল।
- পাদ্রীশিবপুর মিশনের ম্যাপ ও চিত্র, লিপিফলক ও ফটো, ঘর-বাড়ি, প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠান – এ গুলো আমাদের কাছে লিখিত তথ্য হিসেবে কাজ করেছে এবং যা প্রকাশ্যে কথা বলে ও সাক্ষ্যদান করে।
- দ্বাদশ ভাগ: পরিশিষ্ট-৩-এ উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্রসমূহ।
- বংশ-তালিকায় উদ্ধৃত যারা বেঁচে আছে বা মরে গেছে তারা সবাই এই বইতে জীবিত; যারা দেশে আছে বা প্রবাসে আছে তাদেরকে নিয়ে রচিত পাদ্রীশিবপুরের জনপদ; এটা যেন একটি সংগৃহীত ও সংকলিত রচনাবলী।

২) পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য জরিপ ও দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion = এফ.জি.ডি.)

- নানা পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য পাদ্রীশিবপুরে ভিন্ন দুটো জরিপ ফরম এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনার অভিবাসীদের জন্য অন্য ধরনের একটি ফরম ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ৬টি বিষয়ে ২৫টি প্রশ্নের মাধ্যমে দলীয় আলোচন-সভা (এফ.জি.ডি) আয়োজন করা হয় এবং পরবর্তীতে আলোচনার ফলাফল নিয়ে সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়।
- পাদ্রীশিবপুরবাসী জনগণের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও তাদের মতামত জানার জন্য চারটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করা হয়েছে: (১) পাদ্রশিবপুর প্যারিশের দলে ৪২ জন; (২) পশ্চিমবঙ্গের পাদ্রীশিবপুরবাসীদের দলে: ২২ জন; (৩) চট্টগ্রামে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দলে ২৪ জন; (৪) ঢাকাতে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দলে ১৮ জন; (৫) খুলনাতে পাদ্রীশিবপুর অভিবাসীদের দলে ৩ জন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি দলের সঙ্গে ছিলেন গ্রন্থ-সম্পাদক কমিটির ৭জন সদস্যরা। তাদের সবার নাম দ্বাদশ ভাগে-এ উল্লেখ করা হয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সকল জরিপ ও এফ.জি.ডি আলোচনা পরিচালনায় প্রধান ছিলেন ড. মেরী মনিকা গোমেজ এবং সহযোগিতায় ছিলেন জেরী বেসিল গোমেজ। এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের জন্য ড. মেরী মনিকা গোমেজ প্রধান পরিচালিকা, সম্পাদিকা ও ইংরেজী লেখিকা ছিলেন এবং তিনি যাদের (প্রায় ৫০জন) সহায়তা নিয়েছেন তাদেরকে তিনি ইংরেজী ভাষায় লেখা প্রাক-কথনে (FOREWORD) উল্লেখ করেছেন।
- এটা লক্ষ্য করা যায় যে, জরিপে এবং দলগত আলোচনায় সর্বমোট ১৭০ জন সক্রিয়ভাবে মতামত ব্যক্ত করে অংশগ্রহণ করেছেন।
- এই গ্রন্থে জরিপের পরিসংখ্যান ও আলোচনার ফলাফল, আংশিক ভাবে তৃতীয় ভাগে, চতুর্থ ভাগে এবং দ্বাদশ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) প্রবন্ধ সংকলন ও সাক্ষাৎকার:

- গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেন তার নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে তার জন্য বিগত দিনের অনেকের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ লেখা, হয় পুরোটা নয়তো কিছু সম্পদানা করে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তারাও যেন এই গ্রন্থের লেখক। জীবিত না থেকেও এই গ্রন্থের মাধ্যমে তারা তাদের অবদান রাখছে – অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি।
- আবার এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে অনেক ব্যক্তির লেখা, অনেকের সাক্ষাৎকার, প্রয়াত বিশেষ ব্যক্তির জীবন পরিচিতি ও নতুন প্রবন্ধ রচয়িতা।
- পরিশেষে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাদ্রীশিবপুর-অধিবাসী ও পাদ্রীশিবপুর-অভিবাসীরা কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা কী তা জানার উদ্দেশ্যে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিদের চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাদের রচনা এই গ্রন্থকে সমৃদ্ধ এবং সময়োপযোগী করতে সহায়তা করেছে।
- বিভিন্ন শ্রেণিতে যারা প্রবন্ধ রচনায় ও সাক্ষাৎকারে এই গ্রন্থ-রচনায় সহায়তা করেছেন তাদের সংখ্যা ৫০ জনের কম নয়।

গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি ও সাহায্যকারী

গ্রন্থ-সম্পাদনা কমিটি যে দায়িত্বটি পালন করেছেন তা হল: সমবেতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা, জরিপ ও আলোচনার ফলাফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কাজের জন্য ব্যক্তি বেছে নেওয়া, সমন্বয় সাধন করা, প্রয়োজনীয় ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া গ্রন্থ প্রকাশনা ও অর্থায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করা; প্রকল্পের সমন্বয় ও সার্বিক সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করা।

গ্রন্থটি রচনার সরাসরি কাজে নিয়োজিত ছিলেন: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (লেখক ও প্রধান সম্পাদক), যোসেফ ডি'রোজারিও (লেখক ও সহকারী সম্পাদক) এবং প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মেরী মনিকা গোমেজ, এমঅ্যাড, ব্রাক ইউনিভার্সিটি, যিনি স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে "প্রবাসী অভিবাসী বিভাগ"-এর লেখক ও সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। তাদের সকলের মেধা, দক্ষতা, সময় ও শ্রম এই কাজে উৎসর্গ করার জন্য সবার প্রতি রইল আমাদের অজস্র ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অন্যান্য দায়িত্বে চলমান সহযোগী সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন: শ্যামল লরেন্স গোমেজ, জেমস গোমেজ, রীনা যোয়ান্না ডি'রোজারিও, বার্নাড পংকজ ডি'রোজারিও, ইভন ছিলু ডি'রোজারিও।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণযোগ্য করার জন্য দু'জন পাঠক ও বর্ণবিন্যাসকারী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও সংশোধন ও শ্রুতিমধুর করার জন্য মি: জেমস গোমেজ ও মিসেস রোজ আভা গুডা অনেক শ্রম, মেধা ও সময় উৎসর্গ করেছেন। তাদের কাছে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থের টেকনিকাল কাজে যারা সহায়তা দিয়েছেন তারা হলেন: প্রকৌ জেড়াল্ড অলিভার গুডা, যিনি পাদ্রীশিবপুর মিশন কম্পাউন্ডের ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির ব্যবস্থাপনায় ও অর্থায়নে সহায়তা দান করেছেন। যে-তরুণরা গ্রন্থ প্রকাশনা কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে তারা ছিল: গ্রাফিক্স ডিজাইনার জেরমি ট্রয় গোমেজ, যে বিভিন্ন ম্যাপ, ছবি ও লিপিফলক বিষয়ে পরিকল্পনা, সংযোজনা ও সম্পাদনা কাজে, অনেক মেধা ও শ্রম এবং মুদ্রণকাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা দান করেছে। মাঝে মধ্যে অস্কার অর্ক গোমেজ এবং ক্যাথেরিন শ্রেয়া গোমেজ বর্ণবিন্যাসে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-শিল্পী হচ্ছেন মি. মাহবুব রহমান এবং সহযোগিতায় ছিলেন প্রশান্ত গোমেজ। পাদ্রীশিবপুরের প্যারিশের ম্যাপ তৈরিতে এবং মিশন প্রাঙ্গণের অতীত ম্যাপ প্রস্তুতিতে এবং গ্রন্থের ব্যাক-কভার প্রস্তুতিতে অনেক মেধা, সময় ও শ্রম দিয়েছেন মি. কিরিটি সেবাস্তিন গোমেজ ও মি. ফরহাদ মজুমদার ফাহিম। তাদের সবার কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধর্মপাল, পালক ও যাজক, সন্ন্যাসব্রতী

বরিশাল ডাইয়োসিসের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-এর সমর্থন এবং পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের পাল-পুরোহিত ফাদার রবার্ট গমেজ সিএসসি ও সহকারী ফাদার খোকন নকরেক, সিএসসি-এর সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।

পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের সন্তান যাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়া হয়েছে তারা হলেন: ফাদার লরেন্স বরুন গোমেজ, ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ফাদার যেরোম রিংকু গোমেজ, সিস্টার আরতি ডি'কস্তা, এলএইসি, ফাদার লিটন গোমেজ, ফাদার টেরেন্স রড্রিগ্স, ফাদার রুবেন গোমেজ, ফাদার রিগন ডি'কস্তা। তারা লিখিতভাবে অথবা সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা-সভায় যোগদান ক'রে তথ্য-সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

সুতরাং বলা যাবে যে, ঐতিহাসিক লিখিত তথ্য ছাড়া যে মতামত এই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে তা কিন্তু এসেছে শেকর থেকে; প্রয়াত ও জীবিত অনেকের লেখা, অনেকের চিন্তা-ভাবনার ফসল, অনেকের সম্পৃক্ততা ও অবদান। সামগ্রিক ভাবে এই বইয়ের রচয়িতা ছিলেন প্রায় ২২০ জন ব্যক্তির অধিক।

প্রসঙ্গত একান্ত উল্লেখযোগ্য যে, যাদের লেখা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাদের মতামতের জন্য দায়বদ্ধতা তাদেরই কাছে; তাদের মতামতের সাথে সম্পাদকবৃন্দ সর্ববিষয়ে একমত পোষণ না-ও করতে পারেন।

আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই যা পাঠকবর্গকে স্মরণে রাখতে হবে। কোন জরিপ ও তথ্য-সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিখূঁত সম্ভব নয়। সমাজবিদ্‌রা প্রতিটি সামাজিক জরিপ ও তথ্যানুসন্ধানে প্রায় শতকরা দশভাগ ভুল থাকতেই পারে বলে স্বীকার করে নেন। অতএবং এই বইয়ের তথ্যের ব্যাপারেও সেই ধরনের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

সমাপনী কথন

উপরে উল্লেখিত কয়েকটি অনুচ্ছেদে স্মরণ করেছি অনেক মানুষের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা, সহায়তা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ; গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বহু মানুষের শ্রম ও মেধা, চিন্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; কত ভক্তবিশ্বাসী, ভক্তপ্রেমিক ও ভক্ত-প্রত্যাশী মানুষের সাক্ষ্যদান; অসংখ্য মানুষের খ্রিস্টীয় জীবনসাধনা, জীবনধারা, জীবন-সম্পদ যা খ্রিস্টান জনপদকে করে তুলেছে ঐশ্বর্যশালী ও ঐতিহ্যবাহী; অসংখ্য মিশনারি বিশপ-ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার ও ভক্তসেবক-সেবিকাদের বিচরণ, আচরণ ও কর্মসেবন; কত মানুষের সাধন-ভজন, শিখন-পালন, আবরন-আচরণ এবং পরিচালন ও প্রতিপালন; শ্রীমন্ত নদীর মিলন-মোহনায় কত হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ভাইবোনদের রয়েছে আনাগোনা, চলা-ফেরা, লেনা-দেনা এবং একসঙ্গে পথচলা।

উপসংহারে উক্ত চেতনায় আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রকাশ করি যে, এই গ্রন্থের বিষয়-প্রতিপাদ্যের লেখক-রচয়িতা সবাই। সবার প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা। সবার প্রতি উৎসর্গীকৃত হল এই গ্রন্থটি। শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর কাল-কালান্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক ঐতিহ্যবাহী এই খ্রিস্টীয় জনপদ।

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ভক্তজনগণের প্রার্থনা

হে প্রেমময় স্বর্গীয় পিতা
পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠার দুইশত ষাট বছর বর্ষ-পূর্তিতে
আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করিঃ
বাণীপ্রচারক সকল ধর্মপাল, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের জীবন ও সেবা;
কত শত লোক তোমার পুত্র যিশুতে দীক্ষা লাভ করে
যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবন যাপন করেছে।
আর রচনা করেছে শ্রীমন্ত-বাটে এতিহ্যবাহী খ্রিস্টান জনপদ।

পাদ্রীশিবপুরবাসী সকলের প্রতি
তোমার অফুরান ভালবাসা ও দয়ার জন্য আমরা তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।
তুমি আমাদের সঙ্গে পথ চলেছো
তাদেরকে তুমি করে তুলেছো তোমার আপনজন
এবং তাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছো
ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপথ, শ্রীমন্ত বাটে।
'তোমার দয়া সে-তো চিরকালেরই দয়া'!

আমাদের ধর্মপল্লীতে যুগযুগ ধরে
বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনে তুমি আহ্বান করেছো
পরিবার থেকে তুমি আবার কাউকে যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে ডেকেছো,
তুমি আবার কাউকে মনোনীত করেছো ধর্মপালরূপে,
এ সব আহ্বান, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আমাদের প্রতি তোমার ভালবাসা ও দয়ার প্রকাশ,
আমরা তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি ॥

অনুনয় করি প্রভু,

আমাদের আপনজন, যারা মৃত্যবরণ করেছেন
তাদেরকে তুমি অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি দান কর।
ধর্মপল্লীর সকল নিবাসী, অভিবাসী ও প্রবাসী ভক্তবিশ্বাসীদের প্রতি
তোমার ভালবাসা ও দয়া, ক্ষমা ও পরিত্রাণ দান কর।
সকল পরিবার, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও ধর্মপালকে আশীর্বাদিত কর,
শিশু, কিশোর ও তরুন-তরুনীকে আপন জীবন আহ্বানে পরিচালিত কর ॥

এই পুস্তকে যাদের কথা আমরা স্মরণ করেছি
কতো সন্তর্পণে তাদের জীবনে দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করেছি যে,
তাদের অতীতের জীবনপথ ধরে তুমি পথ চলেছো।
এ ইতিহাস তাদের বিশ্বাসেরই ইতিহাস
এ ইতিহাস তাদের মাঝে তোমার মুক্তিকর্মের সাক্ষ্যদান।

আজ পাদ্রীশিবপুরের জনগণ বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ভাবে,
আবার তুমিই তাদের একত্র করে রেখেছো তোমার আপন পরিচালনায়।
পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীকে আজ তোমার কাছে সমর্পণ করি:
ভবিষ্যতে তোমাকে নিয়েই যেন এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী পথ চলতে পারে
তোমার পরিচালনায় ও প্রত্যাশায় তারা আশান্বিত হয়ে থাকতে পারে।

পাদ্রীশিবপুর জনগণকে তুমি দয়া কর, আশীর্বাদ কর
এই জগতের তীর্থের সমাপ্তিতে তারা যেন তোমার প্রতিশ্রুত দেশে,
তোমার রাজ্যের মহাভোজে একত্রিত হতে পারে।
আমাদের এই অন্তরের বাসনা ও প্রত্যাশা পূরণ কর।

হে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা, পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া,
তোমার মুখ দেখাও, কোন পথে চলব সেই পথ দেখাও।
তোমার সন্তানদের পথচলা কালে আগলে রাখ।
তুমিই আমাদের ভরসা, তুমিই আমাদের প্রত্যাশা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
ডিসেম্বর ২৫, ২০২৪ খ্রি.; ২০২৫ পুণ্যবর্ষের উদ্বোধন,
পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ-প্রতিষ্ঠার ২৬০তম বর্ষপূর্তি

শুভেচ্ছা বাণী

সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এবং কলেজের ৯২তম বার্ষিকী উপলক্ষে "প্রদীপ-২০২৪" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে এবং সেখানে আমার কিছু কথা রাখার অনুরোধ করায় আমার এই লেখা। প্রথমত স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং স্কুল কর্তপক্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।
এ বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ছিল একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ সময়। শিক্ষার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ, দেশের অবস্থা অবলোকন করে দেশ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লব ঘটায়। বিপ্লবের ফলে দেশের মধ্যে সবার জন্যই হঠাৎ করে একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার সাথে খাপখাওয়াতে সবাইকে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও সেই চ্যালেঞ্জ থেকে ব্যতিক্রম ছিল না।

বিপ্লবের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে এসেছে অনেক ভোগান্তি। আবার বিপ্লবের কারণে জাগ্রত হয়েছে অনেক নতুন নতুন প্রত্যাশা। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে সেন্ট আলফ্রেড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে চলতে হয়েছে এবং আজ শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তিতে সারা বছরের শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা ও বিফলতা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক মুখপাত্র "প্রদীপ ২০২৪"। এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এ বছরে পাদ্রীশিবপুর প্যারিশের ২৬০ বছরের পূর্তিকে লক্ষ্য রেখে একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম গত বছর। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গ্রন্থটি "শ্রীমন্ত-বাটে পাদ্রীশিবপুর ঃ ঐতিহ্যবাহী একটি খ্রিস্টান জনপদ" শিরোনামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত এবং গবেষণামূলক রচনা। বইটির মধ্যে সরাসরি প্রায় ৪৫ পৃষ্ঠারও অধিক সেন্ট আলফ্রেড স্কুল ও কলেজের সূচনা মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত অনেক তথ্য-সম্বলিত লেখা, ইতিহাসের ধারাবাহিকতার বিবরণ এবং স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট বেশ কতক বিশিষ্টজনের নাম ও পরিচয় সংকলিত হয়েছে। অতীতের সব সেবার মতো এই গ্রন্থটিও এ বছরের একটি বিশেষ অবদান। আশা করি স্কুল লাইব্রেরীতে স্থান দিয়ে সবার জন্য গ্রন্থটি পাঠ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে, সেন্ট আলফ্রেড স্কুল ও কলেজের সকল শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক মণ্ডলী, অভিভাবকবৃন্দ, কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গকে আমার কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। আগামী বছরে সকলের সহযোগিতায় শিক্ষার পরিবেশ ও সাফল্য কামনা করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
অবসর-প্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডাইয়োসি।
প্রাক্তণ ছাত্র: ১৯৬১ ব্যাচ।

বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারগণ : "যিশু-হৃদয় প্রভিন্স" প্রতিষ্ঠার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে ধর্মোপদেশ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি
৩০ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

বাংলাদেশে হলি ক্রস সংঘের ব্রাদারগণ এবং ফাদারগণ এ বছর প্রভিন্স রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রজত-জয়ন্তী পালন করছেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র যিশু হৃদয়ের ভাইস-প্রভিন্সটি পুর্ণ "প্রভিন্স" হিসেবে হলি ক্রস সংঘে মর্যাদা লাভ করে। এই ঘটনার স্মরণার্থে আমরা আমরা আজ সমবেত হয়েছি এবং তারই রজত-জয়ন্তী উদযাপন করছি। পচিশ বছর আগেকার ঘটনার উদযাপন করতে গিয়ে, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি অতীত ইতিহাসের কয়েকটি মাইলফলক।

"ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, ফ্রান্স দেশের চরম দুর্যোগের সময় ল্য-মাঁ ধর্মপ্রদেশের বাসিন্দা ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো নামক একজন ধর্মপ্রদেশীয় পুরোহিত হলি ক্রস সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন"। প্রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ল্য মাঁ ডাইয়োসিসের, "রুইয়ে-সুর-লোয়া" নামক একটি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ছিলেন ফাদার জ্যাক ফ্রাঁন্সোয়া দুজারিয়ে। ফাদার দুজারিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে

ভক্তজনগণের মধ্য থেকে কয়েকজন নিয়ে সাধু যোসেফ' নামে একটি "ভ্রাতৃ-সমাজ' গঠন করেন। ফাদার মরো ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সহায়তার জন্য, বিশেষভাবে প্যারিশে নির্জনধ্যান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে পাঁচ জন ধর্মপ্রদেশীয় পুরোহিতদের নিয়ে একটি সমাজ-দল গঠন করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ এই দুটো সমাজ-দল' একটি "মৌলিক চুক্তি" র মাধ্যমে ফাদার বাসিল মরো একত্রিত করে "হলি ক্রস" নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল পালকীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে সেবাকাজ করা। আবার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরো কয়েকজন নারীদের একটি সমাজ-দলে সংগঠিত করলেন। এভাবে ফাদার মরো, স্বায়ত্তশাসিত তিনটি শাখা একত্রিত করে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করলেন যার নামকরণ হল "হলি ক্রস সংঘ" কেননা "হলি ক্রস" ("স্যান্ত ক্রোয়া") প্যারিশে ছিল তাদের অবস্থান। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ফাদার বাসিল মরো হলি ক্রস সংঘে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

"হলি ক্রস সংঘের পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারগণ যথাক্রমে সালভাতোরিস্ট, যোসেফাইট এবং মেরীয়ানাইট নামে আখ্যায়িত হতে থাকেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়েছিলেন যেন তাঁরা পবিত্র পরিবার' এর দৃশ্যমান অনুকরণে তাদের জীবনযাত্রা ও কাজে একত্রে সংযুক্ত থাকেন। তাঁদের এই একতাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন এমন এক শক্তি যার দ্বারা গোটা জগতটাই আলোড়িত, অনুপ্রাণিত ও পবিত্রীকৃত হয়ে উঠবে।" আমার সর্বদায়ই মনে হয়েছে যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মণ্ডলী সম্বন্ধে এই ধারণাটি ছিল একটি অগ্রণী দর্শন ও প্রাবক্তিক সিদ্ধান্ত।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে হলি ক্রস সংঘটি বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে মিশনারি কাজের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তৎকালীন ভারতের পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত কঠিন পরিস্তিতিতে মিশন-দায়িত্ব গ্রহণ করার শর্তে, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠাতা ফাদার মরো পূর্বৃবঙ্গে হলি ক্রস সংঘের মিশনারি হিসেবে প্রথম একটি দল প্রেরণ করেন।

আমাদের সংবিধানে যেমন আছে: "যুগের প্রয়োজনে নতুন নতুন সেবাকাজে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, পবিত্র ক্রুশ সংঘ, একই সন্ন্যাসজীবনের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যাজক ও ভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীরা একত্রে মিলে সেবাকাজের বিশিষ্টধারা বজায় রাখবে – এ যেন পুরাতন বৃক্ষেই নতুন পল্লবের আবির্ভাব। ফাদার মরো যেমন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পরিকল্পনাটি "বাহ্যতঃ অবিচক্ষণ" হলেও, তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাজ।"

পোপের দপ্তর "প্রোপাগাণ্ডা ফিদে" ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে একটি স্বতন্ত্র ডাইয়োসিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে পৃথক করে চট্টগ্রামকে একটি নতুন ডাইয়োসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন ঢাকা ডাইয়োসিসের দায়িত্ব "ঢাকা ভিকারিয়েট" -এর আওতায়, আমেরিকা থেকে আগত হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার মিশনারিদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে

তৎকালীন চট্টগ্রামের সাথে আসাম ও মিয়ানমাররের কিছু এলাকা নিয়ে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা করা হয় যার পরিচালনার দায়িত্ব "চট্টগ্রাম ভিকারিয়েট" -এর আওতায়, কানাডা থেকে আগত হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার মিশনারিদের তত্ত ¡াবধানে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সংঘের জেনারেল চ্যাপটারে সিদ্ধান্ত মোতাবেক হলি ক্রস ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য পৃথক পৃথক প্রভিন্স গঠন করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘে চারটি "ডিস্ট্রিক্ট" এর উদ্ভাবন ঘটেঃ আমেরিকান ফাদার-ব্রাদাদের জন্য ঢাকা ডাইয়োসিসে পৃথক দুটি "ডিস্ট্রিক্ট" এবং কানাডিয়ান ফাদার-ব্রাদারদের জন্য চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে পৃথক দুটি "ডিস্ট্রিক্ট" গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই (১৯৭১ খ্রি.), হলি ক্রস সংঘের দেশী-বিদেশী সকল সদস্যের মধ্যে বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী এবং স্থানীয় হলি ক্রস সন্ন্যাস-সংঘ গড়ে তোলার একটি চিন্তা জাগ্রত হয়। এই প্রক্রিয়া সেই সময়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে; তা পরবর্তীতে আরও পরিপক্ক, সাবলীল, সক্রিয়, উদ্যমী ও আধ্যাত্মিকতায় বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। তবে হলি ক্রসের ভবিষ্যৎ ভাবনা সংঘের মৌলিক আদর্শ ও ভাবমূর্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দূরদর্শী রূপরেখা সামনে রেখে, ঐক্যের সহযাত্রায় পথ চলবে এবং বাংলাদেশের হলি ক্রস সংঘ স্থানীয় মণ্ডলীতে, দেশের জনগণের মধ্যে এবং বিশ্বজনীন হলি ক্রস সংঘের মধ্যে তাদের স্বকীয়, প্রাবক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে মনোযোগী হবে -- এই ছিল সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত বাংলাদেশের পবিত্র ক্রস সংঘের ভাবনা।

এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে হলি ক্রস ফাদারদেরকে নিয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট করার পক্ষে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। তারা মনে করেন যে, বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের জন্য যদি একটি ডিস্টিক্ট হয় তাহলেঃ হলি ক্রসের জন্য একটি সমন্বিত স্থানীয় ও দেশীয় রূপরেখা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে; সংঘবদ্ধ জীবন ও মিশন শেয়ার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে; ভবিষ্যতে একটি প্রভিন্স হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে; বাংলাদেশে হলি ক্রস সংঘের জীবন-আহ্বানে গঠন-প্রশিক্ষণে, মিশনকাজে, প্রশাসনিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় ঐক্য সৃষ্টি হবে এবং আর্থিক ও জনবল সংক্রান্ত এবং কাঠামোগত অপচয় বর্জন করে মানবসম্পদ ও অর্থ সম্পদের সাশ্রয় হবে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, পবিত্র হলি ক্রস সংঘ একটি দেশীয় ও সংস্কৃত্যায়িত রূপ ধারণ করবে।

হলি ক্রস ফাদারদেরকে নিয়ে একটি "বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৩ মে ১৯৮৪ খিস্টাব্দে। ১৩ বছরের চিন্তাভাবনা, শ্রম-মেধা, সিদ্ধান্ত ও কাজের ফসল হিসেবে এটি ছিল যুগান্তকারী একটি ঘটনা। দুটো ডিস্টিক্টকে

একত্রীকরণের সময় ঢাকা ডিস্টিক্ট সুপিরিয়র ফাদার টিম, সিএসসি এবং চট্টগ্রাম ডিস্টিক্ট সুপিরিয়র ফাদার প্যাট্রিক সক্রিয় প্রচেষ্টা ও অবদান রাখেন।

"বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট" হওয়ার চার বছরের মধ্যে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২ ডিসেম্বর ভাইস-প্রভিন্স হিসেবে হলি ক্রস ফাদারগণ স্বীকৃতি লাভ করে। এই উপলক্ষে ব্রাদার ও ফাদারগণ মিলে যৌথভাবে দু' দিন ব্যাপী একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সুপিরিয়র ফাদার টমাস জিম্মারম্যান এবং সুপিরিয়র ব্রাদার জন রোজারিও।

পূর্ণাংগ প্রভিন্স হওয়ার জন্য সংঘের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পাঁচটি শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়। শর্তগুলি ছিলঃ (১) যথেষ্ট সদস্য সংখ্যা থাকতে হবে; (২) আহ্বানের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে; (৩) গঠনদানে সামর্থ্য থাকতে হবে; (৪) সংঘের মধ্যে নেতৃত্বদানের সামর্থ্য থাকতে হবে; (৫) সংঘের জীবন ও মিশনের জন্য আর্থিক সামর্থ অর্জন করতে হবে। এ সময়ে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা ভাইস-প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ দশটি বছর পথচলার পর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আরোপিত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে হলি ক্রস সংঘের জেনারেল চ্যাপ্টার বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের ভাইস-প্রভিন্সকে "পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স" হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করেন। "পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স" -এর প্রথম প্রভিন্সিয়াল হিসেবে ফাদার স্টিফেন গমেজকে নির্বাচিত করা হয়।

ঐ সময়ে সংঘের পরিসংখ্যান ছিলঃ চারজন বিশপ, ৩৬জন পুরোহিত (১২জন বিদেশী এবং ২৪জন দেশী); সাময়িক ও আজীবন সন্ন্যাসব্রতী ছিল ১৭ জন এবং ৩ জন নবিস।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে একজন হলি ক্রস সংঘের মিশনারি একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "হলি ক্রস সংঘ সর্বদাই ইনক্লুসিভ (অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে তাদের পথচলা), কোনো সময় এক্সক্লুসিভ নয় (অর্থাৎ কাইকে বাদ দিয়ে পথচলা নয়)"। এ কথাটি আমাদের সন্ন্যাসজীবন, মিশনকর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, অন্য সন্ন্যাসসংঘ ও মণ্ডলীর সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কথা বলে। এই কথটি আগামী কালের পথচলায় অন্তরে গেঁথে রাখতে হবে।

ইতিমধ্যে বিগত ১৭০ বছরে বাংলাদেশে হলি ক্রস সংঘের অনেক জয়ন্তী পালিত হয়েছে। সর্বশেষ আজকের জয়ন্তী উৎসব পালন করতে গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার বাসিল মরোর কয়েকটি নির্দেশনা স্মরণ করি। উক্ত নির্দেশনাবলির আলোকে পবিত্র যিশু হৃদয় সংঘের সদস্য হিসেবে আমাদের অন্তরে আছে তিনটি

অনুভূতিঃ কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা, অনুতাপ ও ক্ষমা যাচনা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করা।

(১) বাংলাদেশে বিগত ১৭০ বছরের জীবন-সাধনা, কর্মযজ্ঞ ও মিশন-কার্যক্রম প্রভৃতি, ধন্য বাসিল মরোর কথা অনুসারে, এ সবকিছু আমাদের কাজ নয় – এ কাজ ঈশ্বরের কাজ। তাই আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের সকল কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এ ক্ষেত্রে সকল ব্যর্থতার জন্য আমরা অনুতপ্ত। ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার করি যে, ঈশ্বরের কাজ বলেই আমরা যেন সবকিছুকে গণ্য করতে পারি।

(২) ফাদার মরো বলেছেনঃ “একা গড়ে না কেউ, গড়ে সকলে মিলে”। এই উক্তির সফলতা যাকিছু আমাদের হয়েছে তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। সকল ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। অঙ্গীকার করি ভবিষ্যতে সবার সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে পথ চলব।

(৩) ধন্য ফাদার মরো সংঘের ব্রাদার, ফাদার ও সিস্টারদের মধ্যে দেখেছেন “পুণ্যতম পরিবারের আদর্শ” । এই আদর্শ যতটুকু সাক্ষ্যদান করতে পেরেছি, তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অপারগতার জন্য আমরা অনুতপ্ত। “পুণ্যতম পরিবারের আদর্শ” – ব্যক্তি জীবনে, সংঘে ও মণ্ডলীতে আরও উজ্জ্বল সাক্ষ্যদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করি।

(৪) ধন্য ফাদার মরো আমাদের বলেছেনঃ “ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখ, তিনি যথাসময়ে সবকিছু দেবেন” । ধন্য ফাদার মরোর সন্তান হিসেবে আমরা যতটুকু এই শিক্ষা জীবনে বাস্তব করে তুলতে পেরেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি। ব্যর্থতার জন্য আমরা ক্ষমা-মার্জনা যাচনা করি। আর ভবিষ্যতে এই আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে উঠতে প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

(৫) প্রৈরিতিক কাজে “উদ্যম ও আগ্রহ” আমাদের সংঘের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমাদের সেবাকাজের সকল আগ্রহের সাফল্য স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রেরণা থেকে আগত এবং তার অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জনাই। যুগ লক্ষণ চিহ্নিত করে, সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের সকল অবহেলার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। উদ্যম ও আগ্রহভরে সবকিছু করতে ভবিষ্যতে আমরা প্রত্যাশা রাখি।

(৬) ধন্য ফাদার মরো বলেছেনঃ “আমরা ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষক“” ।   তিনি আরো বলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে আমরা “মন ও হৃদয়” এর বিকাশ সাধন করি। এই উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও পালকীয় কাজে, দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের বিশ্বস্তা ও নিষ্ঠা যা ব্যক্ত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের জীবন-গঠনে যে অবদান রাখতে পেরেছি তার জন্য পবিত্র আত্মার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অবশ্যই আমরা

স্বীকার করি এই আত্মিক দানে প্রতি আমাদের সকল অবহেলা ও অপরাধ। প্রতিজ্ঞা করি ভবিষ্যতে এই আত্মিক দানের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের শিক্ষা ও গঠনকাজের সেবায় আরও উদ্‌বুদ্ধ হব।

(৭) ধন্য ফাদার মরো আমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: “ক্রুশই আমাদের একমাত্র আশা”। এই বাণী অনুসারে আমাদের জীবনে যতখানি সার্থকতা এসেছে তাঁর জন্য প্রভুর প্রশংসা করি। শোকার্তা মাতা মারীয়ার আদর্শে জীবনের সকল ক্রুশ বহন করে প্রভুকে অনুসরণ করার সাধনায় যে ব্যর্থতা এসেছে তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত। “ক্রুশ বহন করে তোমরা আমার অনুসারী হও” যিশুর এই কথায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, গভীর প্রত্যাশা নিয়ে ক্রুশের পথে চলতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(৮) প্রভু যিশু আমাদেরকে ডেকে বলেছেন: “এসো, আমার অনুসরণ কর” । আজ অন্তরভরে প্রভুর প্রশংসা করি কেননা তিনি তাঁর আহ্বানে আমাদেরকে বিশ্বস্ত রেখেছেন। এও কথাও আমরা বিনম্রভাবে তা স্বীকার করি যে কতবার আমরা তার পথ অনুসরণ করতে পারিনি, পথে হোঁচট খেয়েছি, আমাদের পদস্খলন ঘটেছে। তথাপি প্রভিন্সের জয়ন্তী উৎসবে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে এবং প্রভুতে ভরসা রেখে, আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করি “প্রভু আরও ঘনিষ্ঠভাবে তোমাকে অনুসরণ করব” ।

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় নারী

(কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডিঃরোজারিও, সি.এস.সি)

ভূমিকা

॥ ১ ॥ দেশ-সমাজ-মণ্ডলীতে নারীদের বর্তমান অবস্থান

উদ্বিগ্নতার লক্ষণ

নারী বৈষম্য, নির্যাতন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, শোষণ, ইত্যাদির কাহিনী;

নারীদের নেতৃত্বের দক্ষতার অবমূল্যায়ন, তাদের অবদানের অস্বীকৃতি, তাদের প্রতি অমানবিক আচারণ।

মজুরী, মালিকানা ও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য

মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, নারী ভ্রুণের হত্যা, স্বাস্থ্যসেবা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে বিড়ম্বনা;

পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের শিকার হয়ে আছে।

সংসারের বোঝা নারীর ঘারেই বেশী পড়ে।

নারীদের কষ্টভোগ: যৌন-জীবন, শ্রেণিভেদ, জাতিভেদ, সামরিক বিষয় ঘিরে।

সমাজে ও মণ্ডলীতে যাজকতান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা।

নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা এখনও কথার মধ্যে সীমিত।

নারীদের অবদানঃ

প্রজন্ম, প্রতিবেশী, পরিবেশকে মাতৃত্বের দ্বারা মানবিকতায় যত্ন ও গঠন

খ্রিষ্টান সমাজে বা মণ্ডলীতে নারীরা মেরুদন্ড স্বরূপ।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপরিসীম ও অতুলনীয় এবং নারীতুল্য গুণাবলী উপর প্রতিষ্ঠিত ও তার দ্বারা সমৃদ্ধ।

মানবিক ও খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ: অন্তর্দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা, দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা, যত্ন, ক্ষমা, দরদ, ভক্তি, ধর্মানুরাগ, ঈশ্বরভীতি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের অবদান স্বতঃস্ফূর্ত।

সামাজিক রূপান্তরের শক্তি; অন্যায় সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর পরিবর্তনের দাবিদার

তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্বের সাফল্য প্রশংসনীয়

নারীরা এমন ব্যবস্থা চায় যেখানে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা নিষ্পেষণ করবে না।

॥ ২ ॥ নারী ও পুরুষ সম্পর্কে মণ্ডলীর ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা

সামাজিক ধারণায় যাকে "জেণ্ডার" বলা হয় মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক আলোচনায় "মানুষ" বা "নারী-পুরুষ" সম্বন্ধে ধারণাকে বুঝানো হয়।

(১) পুরুষ ও নারী ঈশ্বরের সৃষ্টি

"পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন"। (আদি ১:২৭)

(২) মানুষ (পুরুষ-নারী) "পরমেশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তি" (কাথলিক ধর্মশিক্ষা ৩৫৫-৩৬১)

- শুধুমাত্র মানুষই (পুরুষ ও নারী) "তার সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালবাসতে পারে"।

- ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হওয়ায় প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তি-মর্যাদার অধিকারী। তার রয়েছে আত্মজ্ঞান ও আত্ম-অধিকার এবং স্বাধীণভাবে আত্মদান করা এবং অন্য ব্যাক্তিদের সাথে একাত্মতায় প্রবেশ করার সামর্থ।
- একই সৃষ্টিকর্তার কারণে মানুষের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। সকল মানুষ ভাইবোন।

- ***(৩) "পুরুষ ও নারী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন"*** (কাথলিক ধর্মশিক্ষা ৩৬৯-৩৭০)
- মানবব্যক্তি রূপে পূর্ণ সমতায় এবং নিজ নিজ সত্তায় পুরুষ ও নারী রূপে মানুষ সৃষ্ট।
- "পুরুষ হওয়া" ও "নারী হওয়া" উত্তম ও ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত। পুরুষ ও নারী একই অবিচ্ছেদ্য মর্যাদার অধিকারী; এই মর্যাদা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের কাছ থেকে আসে।

(৪) "একে অন্যের জন্য" – "দু'য়ে মিলে এক" (কাথলিক ধর্মশিক্ষা ৩৭১-৩৭৩)

- ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে *একত্রে* সৃষ্টি করেছেন এবং বাসনা করেছেন যে, তারা হবে একে অপরের *জন্য*। তিনি মানবসত্তার পূর্ণতা দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিদের মিলনের জন্য।
- পুরুষ ও নারী উভয়কেই ঈশ্বরের দেওয়ান/কর্মচারী হিসেবে জগতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

(৫) নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা

- "ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না" (শিষ্যচরিত ১০:৩৪)। কারণ সকল মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও ঈশ্বরের মতো হয়েই সৃষ্ট হয়েছে, এবং সকল মানুষের মর্যাদা একই ((সামাজিক শিক্ষা ১৪৪)

- ঈশ্বর পুত্রের দেহধারণণের গুণে মর্যাদার দিক দিয়ে সকল মানুষই যে সমান তা প্রকাশ পায়: "এখন আর ইহুদী নেই, গ্রীকও নেই, ক্রীতদাসও নেই; স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রীষ্টযীশুতে এখন আমরা সকলেই এক" (গালা ৩:২৬-২৮)। (সামাজিক শিক্ষা ১৪৪)

॥ ৩ ॥ নারী-পুরুষ সম্পর্কে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা

(ক) নারীদের প্রশ্ন মণ্ডলীর ভাবনা

- মানবজাতির আনন্দ ও প্রত্যাশা, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হয়ে প্রতিটি স্থান ও প্রতিটি যুগের প্রত্যেকজন নারী ও পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ায় তাদের কাছে ঐশরাজ্যের সেই সুখবর ঘোষণা করার জন্য (সামাজিক শিক্ষা ৬০)
- নারী-পুরুষ তারা নিজেরা নিজেদেরকে কীভাবে বুঝবে, নিজেদের সম্বন্ধে ও তাদের আহ্বান সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্ত নেবে সেই ব্যাপারে মণ্ডলী উদাসীন নয়। মানুষের সামাজিক প্রশ্ন সর্বদা মণ্ডলীর ভাবনা হয়ে আছে। আর যুগ-যুগ ধরে মণ্ডলী পুরুষ-নারীর প্রশ্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে আসছে। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষায় পুরুষ ও নারী দ্বারা গঠিত যে সমাজ সেই পুরুষ ও নারী হচ্ছে মণ্ডলীর প্রধান ও মৌলিক বিষয়। (সামাজিক শিক্ষা ৬২)

(খ) মানুষের পতন ও সামাজিক পাপ

- পাপে মানুষের পতন ঘটল। মানুষ (পুরুষ ও নারী) অবাধ্য হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে ও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। পুরুষ ও নারী হিসেবে আপন মর্যাদার স্খলন হল। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেই বিচ্ছিন্ন হলো, অমনি পাশাপাশি মানব-পরিবারের মধ্যে যে আদি বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল তারও অবসান ঘটল।
- পুরুষ ও নারী উভয়েই তাদের দোষের জন্য পরস্পরকে দায়ী করল (দ্রঃ আদি ৩:১২)

- সমাজের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত পাপ; আবার আছে সামাজিক পাপ। ব্যক্তিগত পাপ কোন না কোন কারণে অন্যদেরকে স্পর্শ করে। এ কারণে ব্যক্তিগত পাপ সামাজিক হয়ে পড়ে। তবে যে-কোন পরিস্থিতিতে পাপের দায়-দায়িত্ব সবসময় মূলতঃ ব্যক্তি নিজেরই।
- পাপের পরিণাম পাপের সামাজিক অবস্থাকে স্থায়ী করে তোলে। মানুষের পাপাচার "কৃষ্টিগত" হয়ে ওঠে। পুরুষ ও নারীর মধ্যকার যে অশুভ সম্পর্ক তা মানুষের ব্যক্তিগত পাপেরই পরিণাম যা সামাজিক পাপে পরিণত হয়ে গেছে।
- সমাজের এই কাঠামোগত পাপময়তা/মন্দতা থেকে মানুষকে মুক্ত করা প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর নৈতিক কর্তব্য। ব্যক্তি ভাল কাজ করে সমাজের মন্দতা বা পাপময়তা মানুষ দূর করবে।

(গ) কতিপয় সামাজিক বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা

(১) "পুরুষ" ও "নারী" – এই দুটো ভিন্ন সত্তা একই সম-মর্যাদাসম্পন্ন (যা "স্থীতিশীল" নয়) দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য আছে তা ব্যক্ত করে। সম-মর্যাদার মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য সামাজিক জীবনে মিলন ও ঐক্যের জন্য অপরিহার্য।

(২) "যে বিষয়টি মণ্ডলীতে ও সমাজে নারীদের ন্যায়সঙ্গত জীবন নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে পুরুষ ও নারীর নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে গভীর ও সঠিক জ্ঞান, যার আলোকে পুরুষের সাথে সম্পর্কে নারীর ব্যক্তিগত পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, অর্থাৎ তারা উভয়ে একদিকে ভিন্ন অথচ পরস্পরের সম্পূরক হয়ে থাকবে। এই সম্পুরকতা নারীকে কোন্ ভূমিকা ও কী কাজ করতে হবে শুধু সেই ব্যাপারেই নয়, বরং আরও গভীর অর্থে, ব্যক্তি হিসেবে নারীর অর্থ ও চরিত্রের দিকটা বিবেচনা করতে হবে।" (পোপ ২য় জন পল, *খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ*, ৫০)। (সামাজিক শিক্ষা ১৪৬)

(৩) নারী হচ্ছে পুরুষের পরিপূরক, ঠিক যেমন পুরুষ হয় নারীর পরিপূরক; পুরুষ ও নারী একে অপরকে পরিপূর্ণতা দিয়ে থাকে – শুধু দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ্ থেকেই নয় – বরং সত্তাগত দিক থেকেও। পুরুষ ও নারীর দ্বৈততার ফলেই মনুষ্য-প্রকৃতি হয়ে ওঠে একটি পূর্ণ সত্তা। এটি হচ্ছে "দু'য়ের ঐক্য"। এর ফলে পুরুষ ও নারী আন্তর্ব্যক্তিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে। এই "দু'য়ের একতার" নিকট পরমেশ্বর শুধু সন্তানের জন্মদান ও পারিবারিক জীবন যাপনের দায়িত্বই অর্পণ করেননি, বরং তিনি প্রদান করেছেন ইতিহাস রচনারও দায়িত্ব। নারী হচ্ছে পুরুষের 'সহায়ক' ঠিক যেভাবে পুরুষ হচ্ছে নারীর 'সহায়ক'। নারী ও পুরুষের এই মিলনের ফলে মানবব্যক্তি সম্পর্কে একটি অদ্বৈত ধারণার জন্ম হয় – আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মসমর্থনমুলক যুক্তির ভিত্তিতে নয়, বরং ভালবাসা ও সম-দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে। (সামাজিক শিক্ষা ১৪৭)

(৪) নর-নারীর প্রত্যেককেই নিজ নিজ লিঙ্গ পরিচিতিকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক *পার্থক্য ও পরিপূরকতা* দেওয়া হয়েছে বিবাহের মঙ্গলের জন্য ও পারিবারিক জীবনের উন্নতির জন্য... প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যৌন পরিচিতি অবিচ্ছেদ্য, কারণ বিবাহে দম্পতি হওয়ার জন্য এটি একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ শর্ত (কাথলিক ধর্মশিক্ষা ২৩৩৩; সামাজিক শিক্ষা ২২৪)

(৫) সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রেই নারীসুলভ প্রতিভার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রথম বাস্তব অপরিহার্য পদক্ষেপ হবে শিক্ষা ও গঠন পাওয়ার জন্য পেশাগত জীবনে প্রবেশাধিকার। তবে নারীদের কাজ যেন নারীর আহ্বান ও মর্যাদাকে রক্ষা করে। (সামাজিক শিক্ষা ২৯৫)

(৬) নারীদের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই হবে যখন একদিকে তাদের মাতৃত্বের ও পারিবারিক ভূমিকার সম্মানজনক স্বীকৃতি পাবে, অন্যদিকে তাদের পেশা ও ভূমিকা এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি সত্যিকারে মানবিক হতে পারে।

(৭) পুরুষের কাজসকল অনুসরণ করতে গিয়ে নারী তার নারীত্ব বাদ দিবে এমনটি যেন না হয়; বরং নারীসূলভ মানবতার বিশেষত্ব পরিবারে ও সমাজে আরও পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

(৮) পরিবারে মহিলাদের কাজের উপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। "গৃহস্থালী" কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে ও সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে; এই কাজে স্বামী ও পিতা হিসেবে পুরুষদেরও দায়িত্ব আছে। (সামাজিক শিক্ষা ২৫১)

(৯) কাজের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও আহ্বানের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বৈষম্যের জন্য দায়ী হচ্ছে সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান বেদনাদায়ক অবস্থা, কেননা তারা দেখতে পেয়েছে যে, "তাদের অধিকারের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে" এবং তাদেরকে 'সমাজের প্রান্তসীমায় স্থান দেওয়া হয়েছে, এমন কি তাদেরকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করা হয়েছে'। দুর্ভাগ্যবশত এসব সমস্যার আজো সমাধান হয়নি। আজো এমন ঘটনা ঘটে যার ফলে নারীরা মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং তারা শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়ে। কর্মস্থলে নারীর অধিকারকে কার্যকরভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে বিশেষত বেতন, জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে। (সামাজিক শিক্ষা ২৯৫)

॥ ৪ ॥ মণ্ডলীতে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব

(ক) মণ্ডলীর মধ্যে নারীদের সম্পৃক্ততা যীশুর আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত। যদিও যীশু প্রেরিতদূতদেরকে পুরুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, তথাপি যীশু ঐশরাজ্যের জন্য নারীদের সম্পৃক্ত করেছেন। আসলে তিনি চেয়েছেন যেন নারীরা পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী ও প্রচারক হয়ে ওঠে। নারীদের জীবনের পবিত্রতা ও পরিশ্রম কিভাবে মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছে মণ্ডলীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(খ) মণ্ডলীর জীবনযাত্রা পবিত্র আত্মার বিচিত্র দানে সমৃদ্ধ; এই দানগুলো একেক সময় ভিন্ন ভিন্ন, আবার সেগুলো পরস্পরের সম্পূরক। সুতরাং মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ অনেক। দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সংস্কারের গুণে প্রাপ্ত দায়িত্ব পুরুষ ও নারীর উভয় ভক্তজনগণের জন্য; ভক্তজনগণ যীশুর ত্রিবিধ দায়িত্বের অংশীদার: যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় দায়িত্ব।

(গ) পোপ ২য় জন পল বলেছেন: "কোন বৈষম্য ছাড়া নারীরা মণ্ডলীর জীবনে, মতামত দানে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে" (খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ, ৫০)। তাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ মণ্ডলীর আইন দ্বারা নির্ধারিত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে হতে পারে:

- ঐশতত্ত্ব শিক্ষাদানে
- উপাসনা ক্ষেত্রে: ভক্তজনগণের সেবাকর্ম: সঙ্গীত দল, কমুনিয়ন বিতরণ, পাঠক-পাঠিকা, এমন কি বেদীর সেবিকা...
- পালকীয় ও প্রশাসনিক পরিষদসমূহে
- মাণ্ডলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, প্রশাসনে ও আদালতে
- বিভিন্ন পালকীয় সেবাকাজে: ধর্মশিক্ষা, গরীবদের জন্য সেবাকাজ, ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ
- যেখানে পুরোহিতদের সংখ্যা কম সেখানে ধর্মপল্লীর প্রশাসনিক যত্ন দানের সেবাকাজে।
- যে সেবাকাজগুলো শুধুমাত্র সেবাকারী যাজকদের জন্য সীমিত সেই সব সেবাকর্ম ছাড়া অন্যসব সেবাকাজে

(ঘ) মণ্ডলীর জীবন ও মিশন কাজে অংশগহণ করার জন্য নারীরা শুধু সেবাকারী যাজকত্বের সংস্কার গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে উক্ত সংস্কারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সেবাকর্মেও অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এই পরম্পরাগত ঐতিহ্য মণ্ডলী সর্বদাই খ্রীষ্টের ইচ্ছা, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা এবং তাঁর স্বেচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করে আসছে। যীশু শুধু পুরুষদের মধ্য থেকে দ্বাদশ প্রেরিতদূতদের বেছে নিয়েছিলেন। এই সত্য খ্রীষ্ট ও তাঁর ভার্যা এবং তাঁর বধু মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়টি নারীর মর্যাদা বা পবিত্রতার উদ্দেশ্যে আহ্বানের সঙ্গে জড়িত নয়; এটি মাত্র সেবাকার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(ঙ) পোপ ৬ষ্ঠ পল বলেছেন: "যীশু যা করেছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না, এমন কি নারীদের প্রতি তাঁর আহ্বানও নয়; তবে খ্রীষ্টীয় সমাজ জীবনে তাদের মঙ্গলবাণী প্রচারকাজে তাদের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি দিতে হবে ও তা আরও জোরদার করতে হবে।" (খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ, ১৯১)।

তথ্যপঞ্জি

১) *ভাটিকান দ্বিতীয় মহাসভার দলিলসমূহ*, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০
২) *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ
৩) *খ্রীষ্টমণ্ডলীল সামাজিক শিক্ষা*, ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ঢাকা, ২০০৪

"দীনদুঃখীদের জন্য প্রার্থনা-দিবস"
১৭ই নভেম্বর, রবিবার, ২০২৪ খ্রি.

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের নির্দেশে, সাধারণকালের ৩২তম রবিবার ১৭ই নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি., দীনদুঃখীদের উপলক্ষে অষ্টতম বিশ্ব প্রার্থনা দিবস পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের দেয়া বাণীর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি। আশা করি দিবসটি পালনে এই কথাগুলো সহায়ক হবে।

"দীনদুঃখী যদি প্রার্থনা জানায়, তা সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কানে যায়" (বেন-সিরাখ ২১:৫)

দীনদুঃখীদের প্রার্থনা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সরাসরি চলে যায়। দীনদুঃখীদের প্রার্থনা তাদের মুখের দিকে তাকালেই বুঝা যায়; এ ভাবে দীনদুঃখীদের সাথে আমাদের একটা সাক্ষাৎ হয় ও তাদের সাথে একাত্মতা উপলব্ধি হয়।

বেন-সিরাখ একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তিনি প্রজ্ঞার অন্বেষণ করেছেন যুববয়স থেকে। "আমি যখন ছোট ছিলাম, কোনো দিকে যাত্রা করার আগে, প্রার্থনায় আমি প্রজ্ঞার অন্বেষণ করেছি।" (বেন-সিরাখ ৫১:১৩)

বেন-সিরাখের যাত্রাপথে একটি জিনিস তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর তাহল: ঈশ্বরের অন্তরে দীনদুঃখীরা বিশেষ স্থান দখল করে আছে, এমন কি তাদের নিজস্ব সকল দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে তা অনুভব করতে পারে।

দীনদুঃখীদের প্রতি ন্যায়সাধন করার জন্য ঈশ্বর সর্বদাই আপেক্ষমান। দীনজনদের প্রার্থনা সকল অন্ধকার বিদ্ধ করে, প্রভুকে না-পাওয়া পর্যন্ত তার কোন স্বস্তি থাকেনা, সে কোন কিছুতে আশা ছাড়ে না, সে ভাবে যে, প্রভু অতি সত্তরই আসবেন। (বেন-সিরাখ ৩৫:১৭-১৮)। ঈশ্বর আমাদের পিতা, তিনি তার সন্তানের প্রয়োজন জানেন। আমরা আসলে সকলেই ভিক্ষুক। কোন কিছুই আমাদের নেই যা ঈশ্বর আমাদের দেননি। অথচ বর্তমানে আমরা ভাবি আমিইতো আমার জীবনে যাকিছু আছে তা আমি অর্জন করেছি, আমি মালিক। তাই নিজেকে ধনী ভাবি। এটা একটি মিথ্যা চিন্তা।

আজ যারা অভাব-অনটনে, যুদ্ধে আক্রান্ত, পথের শিশু, নানাবিধ অভাবে জর্জড়িত তারাই তো "দীনজন" যারা ঐশপুত্রের পরিচয় বহন করে চলছে। তারা প্রত্যেকেই তো আমাদের খ্রিস্টীয় দয়া পাওয়ার যোগ্য। আমরা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত ও সমাজ ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে দীনঃদুখীদের মুক্ত করতে, তাদের উন্নয়ন করতে এবং তাদেরকে সমাজের অংশীদার করতে আহূত হয়েছি। এই জন্যই আমরা তাদের কথা ভাবি ও তাদের আর্তনাদ শ্রবণ করি।

মহান জুবিলী বর্ষের (২০২৫ খ্রি.) প্রস্তুতি স্বরূপ এ বছরটি প্রার্থনার বর্ষ হিসেবে নিবেদিত। "দীনজন" যেমন জাগতিক দিক থেকে অভাবী আছে, ঠিক সেরূপ আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও অনেক অভাবী ভাইবোনেরা আছে: তাদের বিশ্বাস দরকার, ঈশ্বরকে দরকার। আমরা যেন তাদেরকে সঙ্গীত্ব ও বন্ধুত্ব দিতে, তাদের কাছে বাণী শোনাতে, ধর্মসংস্কারের প্রতি অনুরাগ বাড়াতে, বিশ্বাসের পরিপক্কতা বৃদ্ধিতে তাদেরকে সহায়তা থেকে বঞ্চিত না করি।

উপরোক্ত কাজ করতে হলে বিনীত হৃদয়ে আমাদেরকে সাহসের সাথে অভাবী বলে নিজেকে জ্ঞান করতে হবে। সাধু আগষ্টিন বলেছেন: "দীনজন"দের এমন কিছু নেই যা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে। ধনীরা তাদের অহংকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং আমার কথা শোন: সত্যিকারের দীনজন হও, সৎবান হও, নম্র হও।" অপব্যয়ী পুত্র যখন বুঝলো তার কিছুই নেই তখনই ঈশ্বরের কাছে আসল, তার ভালবাসার আলিঙ্গন অনুভব করল।

খ্রিস্টান সমাজের জন্য "দীনদুঃখীদের প্রার্থনা দিবসটি পালন" করা অপরিহার্য হয়ে উঠুক। এটা পালকীয় কাজের একটি সুযোগ, এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে "দীনজন"দের প্রার্থনা শ্রবণ করতে, তাদের উপস্থিতি ও প্রয়োজন উপলব্ধি

করতে, তাদের দিকে নজর দিতে, তাদেরকে সাহায্য করতে এবং আমাদের মাঝে তাদের উপস্থিতি দেখতে।

কলকাতার মাদার সাধ্বী তেরেজা বলেছিলেন যে. তাঁর প্রার্থনা থেকেই তিনি জীবনে সকল শক্তি ও বিশ্বাস লাভ করেছিলেন হতদরিদ্র মানুষদের সেবা করার জন্য। “দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা আমি প্রার্থনায় লাভ করি ... প্রার্থনা করো তাহলে তোমার পাশে গরীবদের তুমি দেখতে পাবে। প্রার্থনা কর তাহলে তোমার চোখ খুলে যাবে, আর তোমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ হবে।”

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, সিএসসি.

সেপ্টেম্বর মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য:
প্রকৃতি বিপর্যেয়ের কারণে পৃথিবীর কান্না শোনার জন্য প্রার্থনা করা।

এসো প্রার্থনা করি যেন আমরা প্রত্যেকে আমাদের হৃদয় দিয়ে শুনতে পাই পৃথিবীর আর্তনাদ এবং পরিবেশ ও জলবায়ূ সংকটে দুর্গতদের কান্না। যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেই পৃথিবীর যত্ন ও রক্ষার জন্যে আমরা প্রত্যেকে যেন ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হই এবং ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

ইদানিং বাংলাদেশের ১১টি জেলা সম্পূর্ণভাবে বন্যায় কবলিত ছিল এবং তার ফলে কতো যে ধ্বংস ও ক্ষত হয়েছে তা এখন ভেসে উঠছে। সারটি দেশের মানুষ সেই দুর্ভোগ লক্ষ্য করেছে এবং কিছু কিছু মানুষ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে।

পোপ মহোদয় প্রশ্ন করেছেন: “পরিবেশগত ধ্বংসের ফলে তোমরা কি লাখো লাখো মানুষের কান্না শুনছো? পোপ মহোদয়ের এই প্রশ্নটি করছেন যখন আমরা এ মাসে, প্রকৃতির প্রতি যত্ন ও ভালবাসার জন্য প্রার্থনা করছি। বর্তমান বিরূপ পরিবেশের কারণে যারা দরিদ্র তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

এ মাসে আমাদের কাছে আহ্বান আসছে শুধু প্রার্থনা করার জন্য নয়। সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ যত্ন ও সুরক্ষার জন্য যেন কোন একটি কাজ করি, পদক্ষেপ গ্রহণ করি, যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, অপচয় বন্ধ করা, যত্রতত্র বর্জ্য না ফেলা, গাছ লাগানো, সকল প্রকার দূষণ (শব্দ, বায়ূ, মৃত্তিকা, নদী-খাল-

বিল, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি) থেকে প্রকৃতিকে মুক্ত রাখা। অন্ততঃ একটি কাজের জন্য আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

পরিবেশের বিপর্যেয়ের কারণে আক্রান্ত মানুষের আর্তনাদ শ্রবণ করি এবং প্রকৃতির যত্ন ও সরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি। আমেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

১লা অক্টোবর, ২০২৪

বালক-যিশুর সাধ্বী তেরেজার পর্ব প্রতিবছরই আমার জন্মদিনে একটি নতুন প্রেরণা ও বার্তা নিয়ে আসে। গতবছর ফ্রান্সের লিজিও শহরে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার আশ্রম, থাকার ঘর, চ্যাপেল দেখে ও তাঁর প্রার্থনার স্থানে বসে এক বিশেষ উপলব্ধি পেয়েছিলাম এবং তাঁর শোবার ঘরে বালিশের তলায় একটি প্রার্থনা রেখে এসেছিলাম: "আমার জন্য প্রার্থনা করো যেন আমি তোমার মতো যিশুকে ভালবাসতে পারি"।

এ বছরে উপলব্ধি হল সাধ্বী তেরজার মতো ১৩ বছর বয়সে, পাদ্রীশিবপুরের পালপুরোহিত ফাদার রড্রিগ্‌স-এর যত্নে, প্রতি সপ্তাহে ক্ষত পায়ে ডেটল দিয়ে পরিস্কার করার দৃষ্টান্ত দেখে, মনে মনে স্থির করেছিলাম আমিও ফাদার হব। জীবনের দ্বিতীয় শৈশবে প্রবেশ করার পরে আমার জন্মদিন আজ নিয়ে যায় প্রথম শৈশবে এবং যতই নবজন্মের দিকে এগিয়ে যাই, ততোই উপলব্ধি হয়, তোমাদের ভালবাসা, সমর্থন, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে দিন দিন শিশু-যিশুর মতো বেড়ে উঠছি। আজ এই দিনে বালক-যিশুর ভক্তা সাধ্বী তেরেজার কাছে প্রার্থনা: "আমাকে তোমার মতো প্রতিদিন শিশু করে গড়ে তোল।"

উপরোক্ত কথাগুলো শেয়ার করে আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আশীর্বাদ করি। অন্তরে ধারণ করে প্রার্থনায় রাখো মোরে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'   রোজারিও, সিএসসি.
১লা অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি.: ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্বদিন; মারীয়ার জপমালা এবং মণ্ডলীর মিশন মাসের ১ম দিন; "সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী"   বিষয়ে মাসব্যাপী বিশ্বজনীন মন্ডলীর সিনড-সভার ১ম দিন এবং আমার জন্মদিন।

১১০তম বিশ্বজনীন অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস
রবিবার ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

"ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে পথ চলেন"

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গোটা মন্ডলীজুড়ে পালিত হচ্ছে, আসছে রবিবার ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, ১১০তম বিশ্বজনীন অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস। যথোপযুক্ত ভাবে এই দিবসটি সর্বত্র পালন করার জন্য পোপ মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে।

এই দিবসটি উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস একটি বার্তা পাঠিয়েছেন যার শিরোনাম ও প্রতিপাদ্য-বিষয় হচ্ছেঃ "ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে পথ চলেন।

সাম্প্রতিক কালে সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী বিষয়ে আমরা অনেক ধ্যান ও আলোচনা করে যাচ্ছি এবং সাথে সাথে কিছু কার্যক্রমও হাতে নিয়ে পথ চলছি। সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলীর গঠন-প্রক্রিয়ায় যে কথাটি কেন্দ্রীয় ভাবে আমাদের মনোযোগের মধ্যে আছে তা হল "সহযাত্রা" , অর্থাৎ আমরা একসঙ্গে যাত্রা করছি, আমরা সবাই সহযাত্রী।

পোপ মহোদয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন যে, আমরাই শুধু সহযাত্রী নই, ঈশ্বরও আমাদের সঙ্গে সহযাত্রা করেন। তাই তাঁর বার্তার মূলকথাঃ "ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে পথ চলেন" । এই কথাগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় মিশর দেশ থেকে ঈশ্বরের জনগণের সেই মহাযাত্রা যেখানে ঈশ্বর নিজেই তাদের সাথে পথ চলেছেনঃ মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, জনগণের আর্তনাদ শ্রবণ করেছেন, জনগণের যাকিছু প্রয়োজন তা তিনি দান করেছেন, সকল শত্রু ও বিপদ-আপদ থেকে তিনি তাদের রক্ষা করেছেন, তাদের সাথে মৈত্রী সন্ধি স্থাপন করেছেন এবং যাত্রা শেষে প্রতিশ্রুত দেশটি তাদের বসবাসের জন্য দান করেছেন।

বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখি কত মানুষ নিজের বাসস্থান ছেড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করছে। এই দিনে আমাদের স্মরণপটে ভেসে ওঠে মিয়ানমিয়ার থেকে তাড়িত সেই লাখো লাখো রোহিঙ্গা এবং দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক বন্যা-দুর্গত অসংখ মানুষ। আমাদের মন্ডলীর মধ্যেও দেখি কত খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যারা জীবনের নানা তাগিদে একস্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে

আমাদের পাশে এসে বসবাস করছে। ঈশ্বর নিজেই তাদের সাথে পথ চলেছেন। তারাও আমাদের সাথে সহযাত্রী হয়ে বাস করতে চায়। আমরা কী তাদের সাথে কোন-না-কোন ভাবে সহযাত্রী হতে পারি?

আজ সকল অভিবাসী ও শরণার্থী মানুষকে স্মরণ করে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করে বলি: "খুলে দাও আমাদের চোখ, উদার করো আমাদের হৃদয়। তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ যেন হয়ে ওঠে প্রভু যিশুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ।"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলীর ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত উপদেশ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি.

"অন্তরে যারা দীন, ধন্য তাঁরা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই"

প্রিয়জনেরা, আমরা আমাদের অন্তরের অনেক ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-সম্মান ও প্রার্থনা-প্রত্যাশা নিয়ে, এই খ্রিষ্টযাগে সমবেত হয়েছি; ঈশ্বরই আমাদেরকে মণ্ডলী রূপে একত্রিত করেছেন; ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃত্যু-বার্ষিকীতে, ঈশ্বর আবার আমাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত করছেন: "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তাঁরা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই" ।

জ্ঞানপুস্তক: (৩:১-৯)

প্রথম পাঠে একটি উক্তি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত: "ধার্মিকের আত্মা ভগবানের হাতে" ।

আজ আবারও শুনছি গভীর বিশ্বাস নিয়ে যে, প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর আত্মা পরমেশ্বরের সঙ্গে রয়েছেন।

ঈশ্বর সেবকের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর বিগত ৪৭ বছরের যাত্রায়, আমাদের ধ্যান-জ্ঞান-আচরনে আমাদের বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে; এবং ঈশ্বরের উপর আরও আস্থা নিয়ে আমরা বলতে পারি, পরমেশ্বর তাকে যাচাই করে দেখেছেন, তিনি

তার জীবনকে যজ্ঞীয় পূর্ণাহুতির মতো করে পরিশোধন করেছেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তাঁর আপনজন। তিনি একজন ধার্মিক।

প্রত্যাদেশ: (২১:১-৭)

দ্বিতীয় পাঠে সাধু যোহন জীবনের শেষের দিকে একটি দিব্যদর্শনে দেখতে পেলেন: নতুন স্বর্গ, পুণ্য নগরী, নতুন জেরুসালেম।

এই দিব্যদর্শনের দৃষ্টবস্তু হচ্ছে নতুন জেরুসালেম, অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলী। মণ্ডলী সজ্জিত হয়ে আছে নববধুর মতো, তার প্রভুবরের আগমন প্রত্যাশায় ও তারই প্রতীক্ষায়।

প্রিয়জনেরা, আমরাও বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলী প্রতীক্ষমান। ঈশ্বরের প্রীতিভাজন ও আমাদের প্রিয় প্রতিপালক ঈশ্বর-সেবকের পবিত্রতা প্রভাসিত হওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনায়, প্রত্যাশায় ও প্রতীক্ষায় রয়েছি।

প্রতিবছর তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীতে, আমাদের প্রিয় ধর্মপাল আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে আমার বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমাদের মণ্ডলীকে প্রস্তুত করার জন্য, মণ্ডলীকে সাজানোর জন্য, যাতে তাঁর পবিত্রতার প্রকাশ ঘটে ও তার ধার্মিকতায় আমরা প্রভাসিত হতে পারি।

মঙ্গলসমাচার: মথি ৫:১-১২

প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে, ৪৭ বছর পূর্বে যে মঙ্গলসমাচার পাঠ করে আমরা তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছিলাম সেই একই বাণী আজ আমরা আবার শুনলাম।

এই অষ্টকল্যাণ বাণীই হচ্ছে যীশুতে জীবন যাপন করার রূপরেখা; পবিত্র, ধার্মিক ও ধন্য মানুষের পথরেখা বা পরম সুখলাভের পথমার্গ হচ্ছে এই বাণী।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মৃত্যু দিবসের খ্রিস্টযাগে ফাদার জিম্মারম্যান এই অষ্টকল্যাণ বাণীর আলোকে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবনকে দেখেছেন এবং পর্যালোচনা করছেন। আর বিগত ৪৭টি বছর ধরে স্থানীয় মণ্ডলীও সেই ভাবে তাকে দেখে গবেষণা করা হয়েছে, লেখালেখি হয়েছে, ধ্যানে-প্রার্থনায় তাঁর সাহচর্য লাভ করেছে এবং তাঁর মধ্যস্ততায় কতো অনুগ্রহ ও আশীবাদ কামনা করেছে এবং মণ্ডলীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন সাধু শ্রেণিভুক্ত করার জন্য।

আমাদের মধ্যে ছিল গভীর বিশ্বাস যে, কল্যাণবাণীকে অনুসরণ করে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়েছেন, অন্তিম সান্ত্বনা তিনি লাভ করেছেন, প্রতিশ্রুত দেশে তিনি অবস্থান করছেন, তিনি পরিতৃপ্ত, ঈশ্বরের দয়া তিনি পেয়েছেন, ঐশদর্শন তিনি লাভ করেছেন, ঈশ্বরের আপনজন বলে তিনি গৃহীত হয়েছেন, এবং তিনি স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন এবং লাভ করেছেন তিনি জীবনের মহা পুরস্কার।

কয়েকটি ধ্যানঃ

অষ্টকল্যাণবাণীকে যদি একটি সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বলতে হয় সিঁড়ির প্রথম ধাপ বা সোপান হচ্ছেঃ "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তাঁরা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই" । তবে এই প্রথম সোপান কেবলমাত্র প্রাথমিক ধাপ বা স্তর বা পদক্ষেপ নয়, বরঞ্চ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্যসকল কল্যাণবাণীর সামগ্রিকতা; প্রথম কল্যাণবাণীটি যেন অন্যসব কলাণবাণীর অগ্রীম প্রাপ্তি।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সকলগুণের সর্বোত্তম হলেও তিনি সাধারণ, নিম্নতার সর্বোচ্চ স্থান, তাঁর সর্বময় আত্মিক শক্তি হচ্ছে তার দুর্বলতা, তার গর্ব হচ্ছে দীনভাব, তার বড়ো অহংকার হচ্ছে অহংকারশূন্যতা, তাঁর বড়ো ক্ষমতা হচ্ছে বিনম্রতা, ধনী হয়েও তিনি দরিদ্র ও দীনজন, অনেক কিছু থাকা সত্বেও তিনি নিঃস্ব, ঈশ্বরের ক্ষুদ্রজন, দীনজন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবনের ধার্মিকতা ও সাধুতা হচ্ছে ঈশ্বরের দান; ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক এবং সবকিছুর দাতা, তাঁরই মহিমা প্রকাশ। ধন্য মরোর কথা অনুসারে "Providence of God" । আর্চবিশপ অন্তরে ধারণ করেছেন যে তিনি শুধু গ্রহীতা। তাই তিনি ধন্য; তাঁর অন্তরের দীনতাই হচ্ছে ঈশ্বরের কর্মকীর্তির প্রকাশ।

প্রিয়জনেরা, আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর প্রতি আমাদের সকল ভক্তি-সম্মান, তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য এবং অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সকল প্রার্থনার জন্য তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করছিঃ

প্রথমত, আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবন দ্বারা এবং জীবনের কোন ঘটনা অথবা তাঁর একটি গুণ দ্বারা আমরা যেন ব্যক্তিগত জীবনে তার স্পর্শ অনুভব করি। এই স্পর্শের অনুভূতি দ্বারাই কিন্তু সজ্জিত বধুর মতো মণ্ডলী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে। এই স্পর্শ, তাঁর মধ্যস্ততায় অনুগ্রহ লাভের জন্য আমাদের প্রার্থনাকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করবে, ভক্তিময় এবং প্রত্যাশী করবে।

দ্বিতীয়ত, আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে "ধন্য" ভুক্ত করণ মূলত আমাদের কাজ নয়। এটা ঈশ্বরের কাজ, আমরা অন্তরে দীন হয়ে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকছি। তবে তার অনুগ্রহ দান গ্রহণ করার জন্য নিজেদেরকে ও মণ্ডলীকে সজ্জিত হতে হবে; ঈশ্বরের সেবকের জীবনের স্পর্শ লাভ করতে হবে। তাই আমরা প্রার্থনায় বলিঃ "তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি কর; এবং তাঁর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত কর।"

তৃতীয়ত, পাঁচ শত বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের মাটিতে খ্রিস্টবিশ্বসের আগমন ঘটেছিল। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, দেশের মাটিতে অনেক খ্রিস্টান সাধুজনের জন্ম হয়েছে। কয়েকদিন পরে (৫ই সেপ্টেম্বর) সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব পালন করব। সাধ্বী মাদার তেরেজা আমাদের এই বাংলাদেশের মাটিতে বহুবার এসেছেন, পদচারণা করেছেন অনেক জায়গায়, সেবা করেছেন এবং তাঁর সংঘের সিস্টারদের দ্বারা সেই সেবা চলমান করে রাখছেন। তাঁরই সাধুতা ও পবিত্রতায় ধন্য হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের মাটি। তবে এখনও "ধন্য " বলে কেউ মাণ্ডলিক স্বীকৃতি লাভ করে নি। যারা ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীকে "ধন্য" শ্রেণিভুক্ত করার কাজে নিয়োজিত আছেন, তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর একদিন বাংলার মণ্ডলীকে আর্চবিশপকে "ধন্য" ঘোষণার মধ্য দিয়ে একটি মহান অনুগ্রহ দান করবেন এবং বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ ধন্য হবে।

তাই আমরা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর পবিত্রতার আবরণে সজ্জিত হয়ে আমাদের আচরণে আরও নিষ্ঠাবান হই। এই অনুগ্রহ আমরা আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় দয়াময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমেন।

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

আগস্ট মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: রাজনীতিবিদদের জন্য প্রার্থনা।

রাজনীতিকদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি: তারা যেন সমন্বিত মানব-উন্নয়ন ও গণমঙ্গলের জন্য কাজ করেন। যারা চাকরি থেকে বঞ্চিত তারা যেন যত্ন লাভ করে। দীন-দুঃখীরা যেন অগ্রাধিকার লাভ করে আর এভাবে রাজনীতিবিদরা যেন তাদের আপন জনগণের সেবার্থে নিবেদিত থাকেন।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় পোপ মহোদয়ের দেওয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্য যে কত সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজনীতিকদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মঙ্গল করা এবং সমাজে গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা। গণমঙ্গল হচ্ছে সমাজে সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যা ব্যতিরেকে মানুষ তার আপন ব্যক্তিমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে না যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায্যতা, ইত্যাদি। গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠার কাজে রাজনীতিকরা নিবেদিত ও দায়বদ্ধ । কেবমাত্র স্বার্থ সন্ধান করা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা রাজনীতিকদের জন্য গর্হিত কাজ।

বাংলাদেশের বর্তমান সংকটে আমরা সকল রাজনীতিকদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা গণমঙ্গলের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের এই নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তাদের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা একান্ত প্রয়োজন। তাদের কল্যাণ আমরা কামনা করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
১লা আগস্ট, ২০২৪ খ্রি.

Bangladesh had won its Independence in 1971 sacrificing human lives of three million people and got separated from Pakistan which was created on the basis of religion in 1947 with cessation from India after negotiation done by the British Ruling Authority.

Independent Bangladesh Constitution had adopted four principles as its foundation: Democracy, Nationalism, Socialism and Secularism (guaranteeing right of every religion but no spirit of communalism). The former East Pakistan became Bangladesh on the basis of mainly cultural identity as uniting force.

In 2022 Bangladesh celebrated the Golden Jubilee of Independence with lots of progress and development in all spheres of life and the nation and Bangladesh has become a role model of development recognized by many in the world.

Unfortunately, after the independence the ruling party who led the liberation could not run the country from 1975 when the Father of the Nation, Sheikh Mujibur Rahaman together with many family members were killed and military rule imposed and patronized the ideology which went against the fundamentals of Independence.

Besides the excellent progress of the country, innumerable dissatisfactions, complains and demands were expressed both by the political parties and people of the civil society against the Government since 2006 namely: violations of human rights, non-democratic practices, spread of corruptions, elections not free and fare, injustices, secret killings, unjust foreign policy, position taken against geo-politics by the Super Power, high prices of daily commodities, increase of gap between the rich and the poor, etc. etc.

Gradually, demonstrations against the government for many years finally reached to one political demand: Topple down the Government which is not validly elected because the main opposition parties boycotted all the previous elections.

In mid-July, the student body came to streets demanding the reform of the unjust Quota for studies and government jobs. It was in the beginning peaceful but later political parties entered into the scene adding their own agenda and started using violent means of fights in the streets, vandalism, burning and killings, destroying the properties of the nations. Hence police and army were deployed to oppose the violent demonstrations and protect the lives and properties of the nation.

The government in power accepted the demands of the students on government quota reform, although not handled properly in the beginning. Already a couple of hundred people were killed. Violent movements have spread all over the country now and yesterday alone 104 people died including students, police forces and other groups.

At present there is only one agenda of the Students as well as other oppositions to topple down the government. On the other hand, Government is determined to safeguard the true principles of the nation.

At this present critical situation of Bangladesh, out of our faith, we express the following:

- Students of the nation started a Movement of Non-Discrimination in a peaceful way, but gradually it led to one demand of the Fall of the Government, which has happened yesterday on 5th August. Thanks to the Students Movement for Justice and Equality.

- Before and during the Movement as well as its aftermath, we are so much saddened and our hearts are mournful because of the number of casualties of human lives. We pray for eternal rest for those who have died and heartiest sympathy towards their dear ones in the family. As citizens we ask forgiveness for all the evils.

- We are also witnessing revengeful actions against people of former regime and destructions of national and individual properties and vandalizing the historical and cultural heritages built since independence of Bangladesh. We pray that all people respect and honour our past traditions and heritage where we all have been rooted.

- At this critical moment our only pursuance is for peace. Violence breeds violence. Hence let us avoid all kinds of violent actions and revenges and opt for peace for each and every one.

- We all want to live in security - free from anxiety, fear and from any harm being done and particularly for the security of cultural and religious minority. Let us pray to God who is the only giver of security.

- We pray to God the Almighty for solace, peace, reconciliation, harmony and security for all.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka
August 6, 2024

SALIENT MILESTONES OF GRADUAL EVOLUTION OF
PASTORAL AND RETEAT CENTER
SAGARDI, BARISAL

1. 1942: Common Holy Cross Novitiate was founded in Noakhali with Fr. Harold Breen csc as the Novice Master, who was followed by Fr. Philip Payent, csc. The Novitiate was temporarily closed because of the lack of Candidates in 1956:
   Those who made Novitiate in Noakhali were: Bro. Joseph Rodriques, Bp. Joachim Rozario, Bro. John Rozario, Fr. Maurice D'Cruze, Fr. Betram Nelson, Bro. Daniel Rozario, Bro. Patrick Ruram. Bro. Lawrence Dias, Bro. Marvyn Baptist, Fr. Augustine Mascarenhans.

2. 1952: The Sacred Heart Scholasticate in Sagardi was founded in Sagardi in January 1952 with Fr. McClure as first Director of the Scholasticate. Intermediate and Bachelor of Science and Arts were studied under the New Brunswick University in Canada. Some professors of B.M College were professors in the institute. Bp. Joachim, Fr. Maurice and Betram Nelson and diocesan Goan priest-candidate, Sebastian Rodrigues and two conferers of Holy Cross from India also studied there.

3. 1958: Joined Holy Cross Novitiate started at Sagardi and four years Novitiate continued in the area of the pond in one floor building and tin shed house where I was one of them and altogether in four years about 20 candidates have gone of the Novitiate. Later Novitiate was shifted to the former LHC Novitiate premise.

4. **1960-1970**: The inauguration of the **Oriental Institute** in Sagardi, Barisal took place on 13th October 1960. The main objective was to be a "Pastoral Training Center" for all Holy Cross Religious coming to Pakistan and Haflong. Two years of Training in Bengali Language and Culture and studies of social sciences and inter-religious dialogue. Fr. Guy Breault, csc wrote three volumes of book for teaching Bangla to the Foreigners.

   Oriental Institute of Sagardi had set up an **"Academy of Oriental Music"** directed by an Executive Committee composed of: Fr. Paulin Demers, Fr. St.-Onge Bro. Raymond Cournoyer, Rita Boucher and Sushil Baroi. The Academy organized three weeks of four courses of intensive session in vocal and instrumental music. The fourth was held in Dhaka, Tejgaon in 1970 Novemeber. They composed all the hymns of Bengali Mass and other Liturgical music.

Oriental Institute was the **Center for Renewal** called by the Second Vatican Council and held many seminars, symposium and workshops and training on: Liturgy, Catechetics, Islamology, Culture and Inculturation, Green Revolution in Agriculture, Cooperative and Credit Union, etc. Many teachers were brought from India, West Pakistan, Rural Academny of Comilla and other Academicians within the country.

Holy Cross gave excellent services to the Diocese of Chittagong and to all the other Dioceses of Bangladesh with inclusive attitude of Team Spirit and with inclusive orientation to all.

5. **1971:** With less Holy Cross personnel missionary, more NGO foreign missionaries and workers came to learn Bengali for shorter period. Slowly it turned into a Hotel recognized by the government as such who sent their officials to live there. Fr. G. M. Tourangeau was director.

6. **1982:** Fr. Patrick D'Rozario, csc came to Barisal to have Pastoral experience along with the teaching job in the Major Seminary. He was also Superior of the District of Chittagong. He replaced in 1983 Fr. Labbe the Parish priest of Padrishibpur who was sick and left for Canada and Fr. Patrick became the Parish Priest.

7. **1984-1986:** The Chittagong Diocese formed **Pastoral Service Team (PST)** in 1984 with initially three persons: Fr. Patrick, Sr. Rose, Mr. Robi D'Costa. However we operated as PST from the Sadar Road Parish and Sisters premise, holding training programs for the lay people, priests Religious and touring the Diocese for different programs at the parish level. From 1986-1989 I was also the Parish Priest of Barisal Parish finding no one replacing the parish Priest Fr. Germain Grandmaision, csc., who had left three yeas ago.

8. **1987-1989:** The PST was planning to make the Oriental Institute as **Pastoral and Retreat Center**. Fr. Labbe was Director of the Oriental Institute after leaving Caritas Bangladesh. In one of the common Bangladesh District Chapter of the Fathers, the final nod was given to set up Pastoral and Retreat Center in Sagardi approving the plan submitted by PST headed by Fr. Patrick.

9. **1990:** The opening of the **Pastoral and Retreat Center (PRC)** at the Oriental Institute, Barisal took place on 14th February, clearly stipulating the role of the Oriental Institute belonging to the Congregation of Holy Cross and the Pastoral Retreat Center belonging to the Diocese of Chittagong.

10. The Objectives and Activities are articulated in the document agreed upon by Fr. Zimmerman, csc, the Superior of the District and Bishop Joachim Rozario, the Bishop of Chittagong. (see Cardinal's Jibon Charita the book pp 70-72.)

Cardinal Patrick, csc.
11th July, 2024.

যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাক্-কথন

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। এই ঘটনা কেন্দ্র করে এ বছরে পালিত হচ্ছে বাংলাদেশে যাজক সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী অথবা পঁচিশ বছর পুর্তির আনন্দ উৎসব। যখনই আমরা কোন ঘটনার বর্ষপূর্তি পালন করি, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমরা অতীতের দিকে তাকাই। অতীত অনেক সময় খুবই দূরবর্তী হতে পারে আবার অতীত হতে পারে মাত্র কয়েক বছরের পূর্বকাল। উভয় অতীতের দিকে তাকিয়ে বর্তমান ঘটনাটির পেক্ষাপট ও যথার্থতা আমরা উপলব্ধি করতে চাই।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের গোড়াপত্তন

পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস রয়েছে। অষ্টদশ শতাব্দীর শেষান্তে ফরাসী বিপ্লব ও যুদ্ধ, তৎকালীন সমাজে রেখে গেছে এমন সব বিধ্বংসী বাস্তবতা যা জাগতিক ও ধর্মীয়, সামাজিক ও কৃষ্টিগত, মানসিক ও আত্মিক জীবনজুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই অবস্থায় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করার জন্য মণ্ডলীর মধ্যে অনেকের উদ্ভাবন ঘটেছে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে একত্রিত করেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ফরাসী দেশের ল্য-মাঁ শহরের শ্রদ্ধেয় ফাদার জ্যাক ফ্রাঁসোয়া দুজারিয়ে। তিনি ল্য-মাঁ ধর্মপ্রদেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য কয়েকজনকে একটি দলে সংগঠিত করেন প্রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। ফাদার দুজারিয়ে "রুইয়ে-সুর-লোয়া" প্যারিশের পালপুরোহিত থাকায় ব্রাদারদেরকে 'রুইয়ের ব্রাদার" বা "সাধু যোসেফের ব্রাদার" বলে অভিহিত ছিলেন।

আবার ইতিমধ্যে পৃথকভাবে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস নাগাদ, ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো একটি ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারিতে শিক্ষকতার সময় আরও পাঁচ জন ফাদারদের একটি দল গঠন করেন। ফাদার দুজারিয়ের অসুস্থতার কারণে সাধু যোসেফ ব্রাদারদের পরিচালনা দিতে অপারগ হওয়ায়, ধর্মপালের অনুরোধে, ফাদার মরো ব্রাদারদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফাদার মরো এই দুটো দলকে একটি "মৌলিক চুক্তি"র মাধ্যমে (১লা মার্চ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ) যাজক ও ব্রাদারদের একত্রিত করলেন। যেহেতু "পবিত্র ক্রুশ" (স্যান্ত ক্রোয়া) ধর্মপল্লীতে অবস্থান করে শিক্ষা ও পালকীয় কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদেরকে বলা হয় "পবিত্র ক্রুশ সংঘ" (কংগ্রেগাসিয়োঁ দ্য স্যান্ত ক্রোয়া)।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরো কয়েকজন মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের জীবন-প্রণালীর জন্য নিয়মাবলী রচনা করলেন; তাদের নাম দিলেন মারিয়ানাইট সিস্টার। অল্প সময়ের মধ্যে ব্রাদারদেরকে যোসেফাইট, যাজকদেরকে সালভাটরিস্ট এবং সিস্টারদেরকে মারিয়ানাইট নামে আখ্যায়িত করে নাজারেথীয় পুণ্য পরিবারের আদর্শে পবিত্র ক্রুশ সংঘটি স্থাপন করলেন এবং পুণ্য পরিবারের নিকট সংঘটি নিবেদন করলেন।

পূর্ববঙ্গে পবিত্র ক্রুশ সংঘ ও সাংগঠনিক কাঠামো

অখণ্ড ভারতে মণ্ডলীর মিশন-দায়িত্ব পালন করার জন্য ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে রোমের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থা বা "প্রোপাগাণ্ডা ফিদে" কর্তৃক অবিভক্ত বঙ্গের জন্য "ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক অব বেঙ্গল" নামে একটি মিশন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মিশনকর্মের সুবিধার্থে "ভিকারিয়েট অ্যাপোস্টলিক অব বেঙ্গল" ভাগ করে মণ্ডলীর দুটো প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নাম হল: "ভিকারিয়েট অব ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল" এবং "ভিকারিয়েট অব ইস্টার্ন বেঙ্গল"।

উপরোক্ত মিশন ব্যবস্থার সূত্রধরে, পবিত্র ক্রুশ সংঘটির অনুমোদন লাভের শর্তে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘ পূর্ববঙ্গে আগমন করে। তিন বছরের মধ্যে পবিত্র ক্রুশ সংঘটি মণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার আওতায় আন্তর্জাতিক সন্ন্যাসসংঘ হিসেবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীকৃতি লাভ করে।

পোপের দপ্তর "প্রোপাগাণ্ডা ফিদে" ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ঢাকা ডাইয়োসিসকে ভাগ করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস নামে নতুন একটি ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা করে। তখন ঢাকা ডাইয়োসিসের দায়িত্ব "ঢাকা ভিকারিয়েট"-এর আওতায় হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার মিশনারিদের হাতে ন্যস্ত করা হয় – যারা পবিত্র ক্রুশ সংঘের আমেরিকান প্রভিন্সগুলির অধীনে ছিল। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের দায়িত্ব "চট্টগ্রাম ভিকারিয়েট"-এর আওতায় হলি ক্রস ফাদার-ব্রাদার মিশনারিদের হাতে অর্পণ করা হয় এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফ্রেন্স-কানাডার প্রভিন্সগুলির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকে।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সংঘের জেনারেল চ্যাপটার অনুষ্ঠিত হয় এবং চ্যাপ্টারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হলি ক্রস ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য পৃথক পৃথক প্রভিন্স গঠন করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘে চারটি "ডিস্ট্রিক্ট" গঠিত হয়: আমেরিকান ফাদার ও ব্রাদাদের জন্য ঢাকা ডাইয়োসিসে পৃথক দুটি "ডিস্ট্রিক্ট" বা সংঘ-জেলা এবং ফ্রেন্স-কানাডিয়ান ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে পৃথক দুটি "ডিস্ট্রিক্ট" বা সংঘ-জেলা গঠন করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববঙ্গ বলি, বা পূর্বপাকিস্তান বলি, বা বাংলাদেশ বলি, এই বঙ্গভূমিতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রকৃতি, মিশন, প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্ধারিত হয়েছে মিশনারি-প্রেরিত দেশের হলি ক্রস সংঘের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো অনুসারে। আর এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক – বিকল্প আর কিছু হতে পারত না। হলি ক্রস সংঘের বিদেশী প্রভিন্সগুলি, পূর্ববঙ্গে কত মিশনারিদের পাঠিয়েছে, কত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে এই দেশে তারা বাণীপ্রচার করেছে, খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং তাদেরকে গড়ে তুলেছে, জনগণের উন্নয়ন সাধন করেছে এবং স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করা এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘকে স্থানীয় সন্ন্যাসব্রতী সংঘরূপে রূপান্তরিত করার সর্বপ্রচেষ্টা তারা চালিয়েছেন। অতীত ও বর্তমানের সবকিছুর জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা কোনদিনই যথেষ্ট হবে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই (১৯৭১ খ্রি.), হলি ক্রস সংঘের দেশী-বিদেশী সকল সদস্যের মধ্যে একটি চিন্তা কাজ করেছে, আর তা হল: বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী এবং স্থানীয় পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘ গড়ে তোলা। এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, তা আরও পরিপক্ক, সাবলীল, সক্রিয়, উদ্যমী ও আধ্যাত্মিকতায় বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। তবে হলি ক্রসের ভবিষ্যৎ ভাবনা সংঘটি তার মৌলিক আদর্শ ও ভাবমূর্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, দূরদর্শী রূপরেখা সামনে রেখে, ঐক্যের সহযাত্রায় পথ চলবে এবং বাংলাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘ স্থানীয় মণ্ডলীতে, দেশের জনগণের মধ্যে এবং বিশ্বজনীন হলি ক্রস সংঘে তার স্বকীয়, প্রাবক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সুতরাং পূর্ববঙ্গে পবিত্র ক্রুশ সংঘের একক ভিকারিয়েট (১৮৫৩ খ্রি) ... দ্বিবিধ ভিকারিয়েট (১৯২৭ খ্রি.) ... চতুর্বিধ ডিস্ট্রিক্ট (১৯৪৭ খ্রি.) ... আবার দ্বিবিধ ডিস্ট্রিক্ট (১৯৮৪/১৯৮৫ খ্রি.) ... দ্বিবিধ ভাইস-প্রভিন্স (১৯৮৮ খ্রি.) ... দ্বিবিধ প্রভিন্স (১৯৯৮ খ্রি.) ... পৃথক দুটো প্রভিন্স-জয়ন্তী (২০২৩ খ্রি.) –– এই বিচিত্র যাত্রার "মহামিলন", "মিশন"

ও "অংশগ্রহণ"-এর সম্মিলিত পথ কোথায়? একসঙ্গে পথচলার ভবিষ্যৎ রূপরেখা কী? রজত-জয়ন্তী উৎসবে আগামী সুবর্ণ জয়ন্তী হাতছানি দিয়ে ডাকছে – আমাদের সাধনায় প্রত্যাশী প্রতীক্ষায় থাকি চলমান (২০২৪ খ্রি. ...)।

বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রশাসনিক কাঠামো একত্রীকরণ (১৯৮৪ খ্রি.)

পবিত্র যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ হওয়ার পেছনে ছিল দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে হয়েছে আমাদের পথচলা। প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটেছিল চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টের **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত চ্যাপ্টার থেকে। এই সময়ে কানাডিয়ান ফাদারদের প্রভিন্সিয়াল ছিলেন ফাদার রবার্ট শকেৎ এবং চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়র ছিলেন ফাদার যোসেফ প্যাটনোড। চ্যাপ্টারে সুপারিশ করা হয়েছিল: "হলি ক্রস ফাদারদের সমন্বয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠন করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।" "বাংলাদেশী হলি ক্রস ফাদারগণ যেন নিয়মিত মিটিং ক'রে একসঙ্গে চিন্তাভাবনা করেন কীভাবে দুটো ডিস্টিক্ট-কে একটি ডিস্ট্রিক্টে রূপান্তরিত করা যায়"। চ্যাপ্টারে আরও বলা হয়: "হলি ক্রস যেন বাংলাদেশে আরও দেশীয় হয়ে উঠতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।" (ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপটার – ২৭-২৯ নভেম্বর, **১৯৭১** খ্রি.) একই সুপারিশ ২৬-২৯ নভেম্বর, **১৯৭৫** খ্রি. অনুষ্ঠিত ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপটার পুনরুল্লেখ করা হয়)।

এ প্রসঙ্গে **১৯৭১** খ্রিস্টাব্দে দুটো ডিস্ট্রিক্টের জনবলের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি:

ঢাকা: বিদেশী ফাদার – ২৬জন; দেশী ফাদার – ৪জন; বিশপ – ২জন: সাহায্যকারী ব্রাদার – ২জন; সেমিনারিয়ান: ২জন

চট্টগ্রাম: বিদেশী ফাদার – ১৫জন; দেশী ফাদার – ৩জন; বিশপ – ২জন; সেমিনারিয়ান – ২জন

দীর্ঘ একটি সময় নিয়ে এই বিষয়টি অনেক আলোচনা হয় প্রথমত চট্টগ্রাম ফাদারদের মধ্যে, পরবর্তীতে ঢাকার ফাদারদের মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়ালদের মধ্যে। সব মহলের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে লিখিত আকারে মতামত ব্যক্ত করা হয়। প্রশ্নের উওর, উত্তরের বিপক্ষে প্রতি-উত্তর দিয়ে সংলাপ চলতে থাকে। কোন সময় সংলাপ বন্ধ হয়ে যায়নি।

বাংলাদেশে একটি ডিস্ট্রিক্ট: পক্ষে-বিপক্ষে মতামত

বাংলাদেশে হলি ক্রস ফাদারদেরকে নিয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট করার পক্ষে বিপক্ষে চট্টগ্রাম ও ঢাকার ফাদারগণ, হয় লিখিত আকারে অথবা নিয়মিত আলোচনা-সভায় তাদের মতামত প্রকাশ করেন। যে-মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

একটি ডিস্ট্রিক্ট-এর পক্ষে মতামত :

একটি ডিস্ট্রিক্ট হলে:

- বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের জন্য ঐকমত্য হয়ে একটি রূপরেখা তেরী করা সম্ভব হবে। (চট্টগ্রাম)
- হলি ক্রস ফাদার হিসেবে সমবেতভাবে জীবন ও মিশন শেয়ার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশে সম্ভাব্য একটি হলি ক্রস প্রভিন্স করার পথ প্রস্তুত হবে। (চট্টগ্রাম)
- বর্তমানে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যে যৌথ গঠন-প্রশিক্ষণ আছে তার আরও উন্নতি হবে। (চট্টগ্রাম)
- পবিত্র ক্রুশের জন্য বাংলাদেশে একটি সংঘ থাকলে আহ্বান ও গঠনের জন্য সঠিক মনোভাব সৃষ্টি করার সুযোগ হবে। (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশী হলি ক্রস সদস্যদের একসঙ্গে আসার সুযোগ হবে যাতে তারা স্থানীয় সন্ন্যাস-সংঘ করতে এবং স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার মূল্যায়ন করতে পারে। (চট্টগ্রাম)
- হলি ক্রস সংঘের ক্যারিজমকে ঘিরে একসঙ্গে একত্রিত করার সুযোগ হবে এবং তা সংঘের এবং মণ্ডলীর কল্যাণে আরও ফলপ্রদ ভাবে ব্যবহৃত হবে। (চট্টগ্রাম)
- নবিসিয়েট ও স্কলাস্টিকেট পর্যায়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘে একই গঠন লাভ ক'রে, ফাদার হবার পর একসঙ্গে জীবনযাপন ও মিশনকর্ম করার সুযোগ আর থাকবে না, এটা দেশীয়দের জন্য কাম্য নয়। (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক হলি ক্রস ফাদারদের জন্য দুটো প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপচয়ের শিকার হয়ে থাকবে। (চট্টগ্রাম)

* উপসংহার: একটি ডিস্ট্রিক্ট -এর পক্ষে উপরোক্ত যুক্তিগুলি চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টের ফাদারগণ ৩০শে অক্টোবরে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আরও প্রস্তাব করা হয় যে, বাংলাদেশে হলি ক্রস ফাদারদের জন্য "ডিস্ট্রিক্ট অব বাংলাদেশ" নামে নতুন একটি ডিস্ট্রিক্ট করা হয়। উপরন্তু উক্ত সমাবেশে প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য ১১টি নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়।

একটি ডিস্ট্রিক্ট-এর বিপক্ষে মতামত

* একটি ডিস্ট্রিক্ট হলে হয়তো একটি প্রভিন্স বা জেনারেলেটের অধীনে থাকতে হবে। একটি প্রভিন্সের অধীনে থাকা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে। (ঢাকা)
* বর্তমান দুটো ডিস্ট্রিক্টে অবস্থানরত বিদেশী ফাদারগণের মধ্যে আছে বিভিন্নতা: ভাষা, কৃষ্টি ও মনোভাবের বিভিন্নতা। অনেক আমেরিকান ভাবে যে কানাডিয়ানদের স্থায়িত্ব নেই; আবার কানাডিয়ানরা মনে করে আমেরিকানরা অনেকটা রক্ষণশীল। (ঢাকা)
* নিয়মিত মিটিং ও সমাবেশের জন্য দূরত্ব একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। (ঢাকা)
* সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য হতে পারে বলে অনেকের মনে আশঙ্কা। (ঢাকা)
* দুটো ডাইয়োসিসের বিশপদের পলিসি ভিন্ন; এর কারণে ফাদারদের মধ্যে সমঝোতার অভাব হলে সংঘজীবন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (ঢাকা)
* উপসংহার হিসেবে বলা হয়: দেশীদের সংখ্যা যখন বেশী হবে তখন হয়তো একত্রীকরণ সম্ভব হবে। একটি ডিস্ট্রিক্ট দেশীদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু বিদেশীদের জন্য নয়। দুটো ডিস্ট্রিক্ট এক হওয়ার আগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: একসঙ্গে নির্জন ধ্যানসভা করা, ত্রৈমাসিক বা ষাম্মাসিক সমাবেশ, পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিদর্শন, ইত্যাদি। ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়রগণ যেন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারে এবং দুটো ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। (Circular Letter No. 2, Fr. Timm, August 1, 1982 – presenting answers to the queries; Circular Letter 4, Nov. 1982 of Fr. Timm – circulating the paper of Chittagong District Fathers to Dhaka District Members seeking feedback)

ঐক্যের আলোচনায় উত্থাপিত প্রশাসনিক বিষয়

উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যার সমাধান বের করা প্রয়োজন, যেমন:

১) দুটো ডিস্ট্রিক "একত্রীকরণ" (Unification) না বলে, কোন দর-কষাকষি বা শর্তারোপ না করে, দুটো ডিস্ট্রিক্ট সমঝোতার মাধ্যমে "এক" (Merger) হয়ে যাওয়া বললে ভাল হবে।

২) চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপ্টারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন শর্ত আরোপ না করে, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট নিজেকে বিলুপ্ত ঘোষণা করবে এবং "ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট"-এর বদলে প্রস্তাবিত নতুন সৃষ্ট "বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক"-এর সদস্য হয়ে প্রশাসনিক ভাবে ইন্ডিয়ানা প্রভিন্সের অধীনস্ত থাকবে।

৩) চট্টগ্রামের বিশপের সাথে চুক্তি, ফাদারদের প্রভিন্স-সদস্য বিষয়, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্টের সম্পদ, প্রাপ্তি ও প্রদেয় হিসাব এবং নতুন ডিস্ট্রিক্টের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর, প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করা হয়।

৪) ইন্ডিয়ানা প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল, ফাদার রিচার্ড ওয়ার্নার এবং কানাডা প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল ফাদার মার্সেল তাইফেরের মধ্যে আলোচনান্তে প্রশাসনিক বিষয়ে সকল সমঝোতা চূড়ান্ত করা হয়।

৫) হলি ক্রস সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল, ফাদার টমাস বারোস, সবকিছুর সঙ্গে অনবরত জড়িত ছিলেন, উৎসাহ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুমোদন করেছেন। (Letter of Fr. Thomas Barrose December 1983)

দুটো ডিস্ট্রিক্টকে এক করার সকল চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টায় ঢাকার ফাদারদের সুপিরিয়র ফাদার রিচার্ড ডব্লিউ টীম এবং চট্টগ্রাম ফাদারদের সুপিরিয়র ফাদার প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সমস্ত আলোচনায়, ব্যবস্থাপনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি

জড়িত ছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন যাতে কেউ যেন অনুভব না করেন যে, সিদ্ধান্তটি কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য এবং সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল সুপিরিয়রদের সকল প্রচেষ্টা।

মার্চ ১৫, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের হলি ক্রস ফাদারগণের পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট সুপিরিয়রসহ কাউন্সিলরগণ আনুষ্ঠানিকভাবে তিন পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করেন যার শিরোনাম হলঃ Statement of Acceptance of Unification of Chittagong and Dhaka District Priests.

১৩ই মে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, "চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট" এবং "ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট"-এর হলি ক্রস ফাদারগণ "বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট" আওতায় এক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে উক্ত তারিখ থেকে এই সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত কার্যকর বলে গণ্য হয়। আমার জানামতে এই উপলক্ষটা আনুষ্ঠানিক মাইলফলক হিসেবে তেমন কোনো ভাবে উদ্‌যাপিত হয়নি।

"পবিত্র যিশু-হৃদয় ভাইস-প্রভিন্স" ও "পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স"

"বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট"-এর আওতায় হলি ক্রস ফাদারদের দুটো ডিস্ট্রিক এক হয়ে যাওয়া ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৩ বছরের চিন্তাভাবনা, শ্রম-মেধা ও সিদ্ধান্ত ও কাজের ফসল ছিল বাংলাদেশে ফাদারদের জন্য একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠন করা। হলি ক্রস ফাদাদের নিয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট হওয়া ছিল নানা দিকে দিয়ে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ও কাজ। এই সিদ্ধান্তের পরে ভাইস-প্রভিন্স এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ প্রভিন্স হওয়াটা তূলনামূলক ভাবে সহজ ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, প্রায় একই সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ব্রাদারগণও দুটো ডিস্ট্রিক্ট মিলে একটি ডিস্ট্রিক্ট গঠন করেন।

"বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট" হওয়ার চার বছরের মধ্যে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর ভাইস-প্রভিন্স হিসেবে হলি ক্রস ফাদারগণ স্বীকৃতি লাভ করে। এই উপলক্ষে দুই দিনের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় নটর ডেম কলেজ, আর্চবিশপ হাউজ এবং মুহাম্মদপুর ব্রাদার বাড়ি। এই প্রোগ্রামটি যৌথভাবে ব্রাদারদের সাথে অনুষ্ঠিত হয় এবং সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সুপিরিয়র ফাদার টমাস জিম্মারম্যান এবং সুপিরিয়র ব্রাদার জন রোজারিও। সুপিরিয়র জেনারেল ফাদার ক্লোড গ্রু, সিএসসি আনুষ্ঠানিক ভাবে ইন্ডিয়ানা প্রভিন্সের অন্তর্গত বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট কে "পবিত্র যিশু-হৃদয় ভাইস-প্রভিন্স" হিসেবে এবং মিড-ওয়েস্ট প্রভিন্সের অন্তর্গত বাংলাদেশ ব্রাদার ডিস্ট্রিক্ট কে "সাধু যোসেফ ভাইস-প্রভিন্স" হিসেবে ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সিয়ালগণ, সুপিরিয়গণ, আর্চবিশপ এবং বিশপগণ, ভারত থেকে আগত হলি ক্রস প্রতিনিধি এবং দেশের অধিকাংশ হলি ক্রস ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ প্রভিন্স হওয়ার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা কয়েকটি শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়। শর্তগুলি ছিল: (১) উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য থাকা; (২) আহ্বানের সম্ভাবনা নিশ্চিত করা; (৩) গঠনদানে সামর্থ্য থাকতে হবে; (৪) নেতৃত্বদানে সামর্থবান সদস্য থাকতে হবে; (৫) সংঘের জীবন ও মিশনের জন্য আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করতে হবে।

পরবর্তী অনুষ্ঠিত ভাইস-প্রভিন্সের চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই চ্যাপ্টারে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তাকে ভাইস প্রভিন্সিয়াল হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

দীর্ঘ দশটি বছর পথচলার পর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে পবিত্র ক্রুশ সংঘের জেনারেল চ্যাপ্টার বাংলাদেশের হলি ক্রস ফাদারদের ভাইস-প্রভিন্সকে "পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স" হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করে। "পবিত্র যিশু-হৃদয় প্রভিন্স" অথবা "পবিত্র যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ"-এর প্রথম প্রভিন্সিয়াল হিসেবে ফাদার স্টিফেন গমেজকে নির্বাচিত করা হয়। ঐ সময়ে সংঘের পরিসংখ্যান ছিল: চারজন বিশপ, ৩৬জন পুরোহিত (১২জন বিদেশী এবং ২৪জন দেশী); সাময়িক ও আজীবন সন্ন্যাসব্রতী ছিল ১৭ জন এবং ৩জন নবিস।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে যিশু হৃদয় সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরের পূর্তিতে আমরা এ বছর রজত জয়ন্তী পালন করছি। এই জয়ন্তী উৎসবে আমার বিশেষভাবে স্মরণ হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে উপরে বর্ণিত বাসনা বা লক্ষ্যগুলি। আরও স্মরণ হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে দেয়া শর্তগুলি যা পূরণে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘ-প্রদেশ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ঐ বাসনা ও শর্তগুলি কত দূরদর্শি হয়ে আমাদের যাত্রাপথ পরিচালিত করেছে বিগত পঁচিশটি বছর ধরে – তা ভেবে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি এবং পরস্পরকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে একজন পবিত্র ক্রুশ সংঘের মিশনারি একটি মন্তব্য করেছিলেন। সেই কথাটি আমার এই লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন: "পবিত্র ক্রুশ সংঘ সর্বদাই ইনক্লুসিভ (সবাইকে নিয়ে তারা পথচলা), কোনো সময় এক্সকুলিসিভ (কাইকে বাদ দিয়ে পথচলা) নয়।" এ কথাটি আমাদের সন্ন্যাসজীবন, মিশনকর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, অন্যান্য সন্ন্যাসসংঘ ও মণ্ডলীর সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কথা বলে। এই কথটি আগামী কালের পথচলায় অন্তরে গেঁথে রাখি।

তথ্যসূত্র:

(১) মরো হাউজ আর্কাইভ: চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের কাগজপত্র ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৪ খ্রি., সুপিরিয়রের সার্কুলার এবং তৎকালীন সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সিয়ালদের কাছে লেখা চিঠিপত্রাদি।

(২) মরো হাউজ আর্কাইভ: ঢাকার ত্রৈমাসিক সভার বিবরণী, বিভিন্ন জনের লেখা, ডিস্ট্রিক্ট চ্যাপ্টার – সুপিরিয়রের সার্কুলার এবং তৎকালীন সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সিয়ালদের কাছে লেখা চিঠিপত্রাদি।

পবিত্র ক্রুশ সংঘ ঃ প্রেরণার বাণী

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ এবং ফাদারগণ এ বছর একটি জুবিলী পালন করছে। জুবিলী পালন করার স্মারকফলক হিসেবে আছে পঁচিশ বছর আগের একটি ঘটনা। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে অবস্থানরত পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক-সমাজ নিয়ে "পবিত্র যিশু-হৃদয়" শিরোনামে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার-সমাজ নিয়ে "সাধু যোসেফ" শিরোনামে পবিত্র ক্রুশ সংঘের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুটো "ভাইস-প্রভিন্স" প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ঘটনাটি রমনা কাথিড্রাল গির্জায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা উদযাপিত হয়। আবার ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে একই পূর্বারোপিত শিরোনামে দুটি পুর্ণ "প্রভিন্স" বা "সংঘ-প্রদেশ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংঘ-প্রদেশ প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে এবছর বাংলাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘে দুটো রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।
বাংলাদেশের পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক-সমাজ, অর্থাৎ "পবিত্র যিশু-হৃদয় সংঘ-প্রদেশ" প্রতিষ্ঠার স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। উক্ত স্মরণিকার জন্য, প্রেক্ষাপট হিসেবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধানের মূল প্রেরণার কথা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ, আমাকে করা হয়েছে।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধানে সন্ন্যাসবতীদের জীবন-প্রণালী ও মিশনকর্ম উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার-সমাজ এবং যাজক-সমাজ উভয়ের জন্যই রয়েছে একই সংবিধান। অতএব সেন্ট যোসেফ প্রভিন্স এবং যিশু-হৃদয় প্রভিন্স-এর জুবিলী উৎসবে সংবিধান থেকে কয়েকটি মূল কথা এখানে তুলে ধরছি। অবশ্যই সন্ন্যাসব্রতী পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক ও ব্রাদারগণ সংবিধানের সবকিছুর সাথে শুধু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্তই নন বরং তাদের আপন জীবনে সংবিধানকে অনেকটাই মূর্ত ও দৃশ্যমান করে রেখেছে যা স্মরণিকার বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

তবে যারা পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতীদের সাথে ততো ঘনিষ্ঠ নন তাদের উদ্দেশ্যেই এই লেখা। এই লেখায় আমি সংবিধানের কাঠামো অনুসরণ করে, প্রয়োজনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি নিয়ে এবং অন্যান্য বিষয় সংক্ষিপ্ত করে প্রবন্ধটি রচনা করছি। সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়গুলো যেমন: পবিত্র ক্রুশ সংঘের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ঈশ্বরের আহ্বান, প্রেরণকাজ, প্রার্থনা, ভ্রাতৃত্ব, আত্মোৎসর্গ ও অঙ্গীকার, গঠন ও রূপান্তর, কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্ব, এবং পরিশেষে ক্রুশই আমাদের প্রত্যাশা, প্রভৃতি আমার নিজস্ব কথা দিয়ে ব্যক্ত করছি।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা: সংঘের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ (পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান পৃষ্ঠা ৬-১০)

"ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, ফ্রান্স দেশের চরম দুর্যোগের সময় ল্য-মাঁ ধর্মপ্রদেশের বাসিন্দা ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো নামক জনৈক পুরোহিত পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন"। প্রায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে একই ধর্মপ্রদেশের "রুইয়ে-সুর-লোয়া" নামক একটি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ছিলেন ফাদার জ্যাক ফ্রাঁসোয়া দুজারিয়ে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'সাধু যোসেফ ভ্রাতৃ-সমাজ' নামে, একটি সমাজ-দল স্থাপন করেন। ফাদার দুজারিয়ের বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ফাদার মরোর হাতে ব্রাদ্রারদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ফাদার মরো ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, প্যারিশে নির্জনধ্যান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সহায়তার জন্য পাঁচ জন পুরোহিতের একটি সমাজ-দলে সংগঠিত করেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ এই দুটো 'সমাজ-দল' ফাদার মরো একটি "মৌলিক চুক্তি"র মাধ্যমে একত্রিত করে "পবিত্র ক্রুশ" নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল পালকীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে সেবাকাজ করা। আবার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরো কয়েকজন নারীদের একটি সমাজ-দলে সংগঠিত করলেন এবং তাদের জন্য তিনি প্রণয়ন করলেন অনুশাসন-নীতিমালা। এভাবে ফাদার মরো, স্বায়ত্বশাসিত তিনটি শাখা একত্রি করে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করলেন যার নামকরণ হল "পবিত্র ক্রুশ সংঘ" কেননা তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ল্য-মাঁ-এর শহরতলীতে অবস্থিত একটি ধর্মপল্লীতে যার নাম ছিল "পবিত্র ক্রুশ" ("স্যান্ত ক্রোয়া")। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ফাদার বাসিল মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

"পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারগণ যথাক্রমে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সালভাতোরিস্ট, যোসেফাইট এবং মেরীয়ানাইট নামে পরিচিতি লাভ করেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়েছিলেন যেন তাঁরা 'পবিত্র পরিবার'-এর দৃশ্যমান অনুকরণে জীবনযাত্রায় ও কাজে একত্রে সংযুক্ত থাকেন। তাঁদের এই একতাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন 'এমন এক শক্তি যার দ্বারা গোটা জগতটাই আন্দোলিত, নিয়ন্ত্রিত ও পবিত্রীকৃত হয়ে উঠবে।"

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পবিত্র ক্রুশ সংঘটি ফ্রান্স দেশের ভেতরে, ইউরোপের অন্যত্র, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় মিশনারি কাজের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তৎকালীন ভারতের পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মিশন-দায়িত্ব গ্রহণ করার শর্তে, পবিত্র ক্রুশ সংঘটি মণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার আওতায় আন্তর্জাতিক সন্ন্যাসসংঘ হিসেবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মে, পবিত্র ক্রুশ সংঘের দুটো পুরুষ সংঘ-শাখা নিয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান অনুমোদন লাভ করে।

"পবিত্র ক্রুশ সংঘের অনুমোদন লাভের অব্যবহিত পরেই ফাদার মরো কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী পুরোহিতের ধ্বংসাত্মক মনোভাবের শিকার হয়ে পড়েন; তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়ে তাঁর তিরস্কার ও সংশোধনী সরলমনে গ্রহণ করতে পারেননি। কিছুকাল নিষ্ফল ও নিরুৎসাহজনক প্রচেষ্টা চালানোর পর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মহাসংঘ্যাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন।" মেরিয়ানাইট সিস্টারদের তত্ত্বধানে থেকে ফাদার মরো ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি মৃতুবরণ করেন।

রোমের সিদ্ধান্তক্রমে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মহিলা সন্ন্যাসব্রতী শাখাটি পুরুষ সংঘ থেকে পৃথক করা হয় এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে "হলি ক্রস মেরিয়ানাইট সন্ন্যাসসংঘ" হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে "সিস্টারস অব দ্য হলি ক্রস" নামে এবং কানাডাতে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে "সিস্টার অব হলি ক্রস" নামে দুটো পৃথক সংঘ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

পরবর্তীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘটিকে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘকাল একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে পার করতে হয়। বেশ কয়েকটি মিশন বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গেও পবিত্র ক্রুশ সংঘের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়

(১৮৭৬-১৮৮৮)। ফাদার মরোর মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তাঁকে সাধুশ্রেণিভুক্ত করার জন্য সংঘ সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। "পুরোহিত ও ব্রাদারদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবে সংঘের জীবনযাত্রা ও কাজে ব্যাঘাত ঘটছে দেখে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সংঘমহাসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তখন থেকে শাখা-সংঘদ্বয় শুধুমাত্র নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে তা নয় বরং প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়েও ব্রাদার এবং পুরোহিতদের প্রশাসন-ব্যবস্থা যৌথ না হয়ে বরং পৃথক থাকবে।"

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার নির্দেশ অনুসারে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধানের সরক্ষরণের কাজ প্রায় দুই দশক ধরে চলতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মহা সাধারণসভায় সংস্কারকৃত বর্তমান সংবিধান রোম দ্বারা অনুমোদন লাভ করে। সংস্কারিত নতুন সংবিধান, প্রতিষ্ঠাতা ফাদার মরোর আদি আদর্শে প্রত্যাবর্তন করায় নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। "আগের ন্যায় পুনরায় সকল খ্রিস্টভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীগণ যোসেফাইট সম্প্রদায়ের (সমাজ-সংঘের) সদস্য হয়েছেন এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় পর্যায়ে আন্তঃসম্প্রদ্রায় (আন্তঃসমাজ-সংঘের) প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতাও স্বীকৃতি পেয়েছে। পবিত্র ক্রুশ সংঘ শুধুমাত্র সেবাকাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদল হিসেবেই নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা দেবে না, উপরন্তু প্রতিষ্ঠাতার মূল নির্দেশিত লক্ষ্যে তাদের আহ্বান অনুসারে যাজক-সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীরা যেন ভ্রাতা হয়ে ওঠে, পরস্পরের সাথে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে এবং পরস্পরের সংগে ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভগ্নীদের সংগে এক হয়ে নতুন সেবাকাজে একসঙ্গে আত্মনিয়োগ করে।" (অনুবাদ সংশোধন করা হল)।

"যুগের প্রয়োজনে নতুন নতুন সেবাকাজে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘ একই সন্ন্যাসজীবনের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যাজক ও ভক্ত-সন্ন্যাসব্রতীরা মিলে সেবাকাজের বিশিষ্ট ধারা অক্ষুন্ন রাখবে বলে আশা করা যায় – এ যেন পুরাতন বৃক্ষেই নতুন পল্লবের আবির্ভাব। ফাদার মরো যেমন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন পরিকল্পনাটি "বাহ্যতঃ অবিচক্ষণ" হলেও, তা স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাজ।"

॥ ১ ॥ ঈশ্বরের আহ্বানঃ "এসো, আমার অনুসরণ কর" (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ১-৮)

যিশু আমাদেরকে আহ্বান করেছেন : "এসো, আমাকে অনুসরণ কর"। আমরা তাঁর এই ডাকে সাড়া দিয়েছি দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সংস্কারের মাধ্যমে যখন আমরা খ্রিস্টান হয়েছি।

আবার বিশেষ একটি সময়ে তিনি আমাদের ডাকলেন আরও একটি পদক্ষেপ নিতে: সেই ডাকটি হচ্ছে পূর্ণভাবে নিজেকে দান ক'রে সকল মানুষের সেবায় ব্রতী হ'য়ে যিশুর জীবনের সহভাগী হতে। পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই এই ডাক আমরা অন্তরে পেয়েছি।

প্রশ্ন এসেছে কোন পথে চলব আমরা। তখনই আমরা দেখেছি: আমাদের পূর্বে যারা সন্ন্যাসব্রতী হয়ে পথ চলেছিলেন তদেরকে, যারা তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে গেছেন তাদেরকে, আবার আমাদের সাম্প্রতিক কালে অনেকেই পথ চলছেন তাদেরকেও। তারা ইশারা দিয়ে আমাদেরকে ডেকেছেন যেন তাদের জীবনযাত্রা ও সেবাকর্মের অংশীদার হয়ে আমরা উক্ত পরিবারের সদস্য হই।

আমাদের জন্য এই পরিবারটি হল পবিত্র ক্রুশ সংঘ – যা প্রতিষ্ঠা করেছেন ফাদার আন্তনী বাসিল মরো। তিনি এখন ধন্য শ্রেণিভুক্ত। সংঘের সদস্যদের মধ্যে আছি আমরা ব্রাদার ও ফাদারদেরকে নিয়ে দুটো সমাজ, তবে উভয়ে এক ও অবিচ্ছেদ্য। প্রতিষ্ঠাতা এক, ঐতিহ্য এক, নিয়মাবলী এক, প্রশাসন এক, জীবনপথ ও এবং মিশনকর্ম এক ও অভিন্ন।

প্রভু যিশুকে অনুসরণ করার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমাদের রয়েছে ত্যাগের অভাব ও অনীহা, আছে ইতস্ততা। তবে আমরা আশাবাদী যে প্রথম শিষ্যদের মতো যিশু আমাদেরকে নিয়ে পথ চলবেন, আমাদেরকে দৃঢ় করবেন বিশ্বাসে।

॥ ২ ॥ প্রেরণকাজ: সংঘের মিশনকর্ম (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৯-২০)

পিতা ঈশ্বর, তাঁর পুত্রকে যেমন পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত করে এই জগতে প্রেরণ করেছেন, আমরাও সেরূপ প্রেরিত হয়েছি ঈশ্বরের রাজ্য ত্বরান্বিত করতে।

"যাজক ও ব্রাদার হিসেবে আমরা একসাথে জীবনযাপন ও কাজ করি। আমাদের পরস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কর্মে সহভাগিতা ঐশরাজ্যের প্রত্যাশাপূর্ণ নিদর্শন হতে হবে; আর তখনই আমরা সেই নিদর্শন হয়ে উঠব যখন লোকে আমাদের পারস্পরিক প্রেমের জীবন দেখতে পাবে।"

খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে আমরা জনগণের পাশে থকি, তাদের ন্যায় সংগ্রাম করি এবং সংঘের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে সেবা করি, আবার তাদের মতো ভালবাসায় নবীকৃত হয়ে, এই প্রত্যাশায় কাজ করছি যাতে একদিন ন্যায় ও প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সংঘের কর্তৃপক্ষ দ্বারা আমরা বিশ্বাসের শিক্ষদাতা রূপে ঐশরাজ্যের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে মিলন সমাজ গঠন করতে প্রেরিত হই।

খ্রিস্টের ন্যায় আমরা দীনদরিদ্রদের নিকট সুখবর প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছি। আমাদের কাজে দীন দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দিয়ে যিশুর মতো সকলের মনপরিবর্তন ও মুক্তির জন্য আহ্বান জানাই। দরিদ্রদের ও নির্যাতিতদের জন্য কাজ করা মোটেই সহজ নয়। যিশুর শিষ্যদের বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সাহস থাকতে হবে। আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য হবে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা ও তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের অনেকেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত আবার অনেকে ধর্মপল্লীতে শিক্ষাদানের আহ্বান পেয়ে থাকেন। তবে যেখানেই আমরা শিক্ষা দিই না-কেন সেখানে আমরা তাদের দানসমুহ আবিষ্কার করতে এবং তার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করি; তাদের জীবনের গভীরতম আশা-বাসনা আবিষ্কার করতে সাহায্য করি। যাদেরকে শিক্ষা দিই তাদের কাছ থেকে আমরা আরও বেশী শিক্ষা গ্রহণ করি।

প্রেরণকাজে আমরা একাধিক জাতি বা কৃষ্টির সংস্পর্শে আসি, তাদের ভালবাসার সুযোগ পাই। আমরা যতটুকু দিই তার চাইতে বেশী আমরা পাই, আমরা সমৃদ্ধ হই। পবিত্র ক্রুশ সংঘের মধ্যে সবাই প্রৈরিতিক কাজে সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত। যে অবস্থায়, যেখানে, যে কাজে থাকি না কেন, আমরা সবাই প্রৈরিতিক কর্মী এবং একই ভ্রাতৃসমাজরূপে আমরা সবাই মিলে প্রভুর প্রেরণকাজে সাড়া দিই।

আমরা আমাদের সেবাকাজগুলো মৌলিক মিশন সম্পাদন করছে কি-না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করি; আমাদের সেবাকাজ মণ্ডলী ও জগতের প্রয়োজনে কতটুকু ফলপ্রসূ হতে পারছে তা যাচাই করে দেখি। আমাদের কাজ প্রভুরই কাজ। অতএব বিনম্র চিত্তে আমাদের সকল কাজ প্রভুর সামনে নিয়ে আসি প্রার্থনায় সেখানেই আমাদের সেবাকাজ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা হয়ে উপস্থিত হয়।

॥ ৩ ॥ প্রার্থনা: সংঘের আধ্যাত্মিকতা ও অনুশীলন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ২১-৩২)

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের প্রাণবায়ূ। "সেই একই আত্মা যিনি প্রভুকে অনুসরণ এবং তাঁর প্রেরণকাজ করার প্রেরণা ও শক্তি যোগান তিনিই আবার আমাদের অন্তরে প্রার্থনা করার ইচ্ছা ও ভাষা জাগিয়ে তোলেন।" ঈশ্বরের

বাণী পাঠ ও ধ্যানে আমরা আমাদের চিন্তাধারা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে দিয়ে তার দেওয়া মিশন সম্পন্ন করতে সাধনা করি।

আমরা প্রার্থনা করি মণ্ডলীর সাথে, সংঘের ভ্রাতাদের সাথে এবং একাকী নির্জনে। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে তাঁকে পিতা বলে আমরা "প্রভুর প্রার্থনা"র সকল আবেদন নিবেদন করি।

আমাদের কর্মজীবন ও প্রার্থনা জীবনের মধ্যে সকল টানাপোড়েনের মধ্যে, পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তির মধ্যে প্রার্থনাই পাবে অগ্রাধিকার, কেননা প্রার্থনাই হবে জীবন-নৌকার হাল। প্রার্থনাই জাগাবে সকল কর্মে প্রেরণা। আমরা কর্মে ধ্যানী, ধ্যানময় কর্মী হতে সাধনা করি। আমরা খ্রিস্টান সমাজের সাথে প্রার্থনা করি, খ্রিস্টযজ্ঞে অংশগ্রহণ করি সংঘের ভাইদের সাথে আশ্রমে ও সংঘে আমরা একসঙ্গে, নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত প্রার্থনা অনুশীলন করি। আরাধনা, নির্জন ধ্যান, মৌন প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক পাঠ আমরা অনুশীলন করি। সংঘের নির্ধারিত পার্বণগুলি একসঙ্গে পালন করি। ভাইদের বিভিন্ন বার্ষিকীতে তাদেরকে স্মরণ করি প্রার্থনায়, তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করি।

"প্রার্থনা তো শুধু আমরাই করি না, স্বয়ং প্রভুর আত্মাই আমাদের প্রার্থনা করেন।"

॥ ৪ ॥ ভ্রাতৃত্ব: সংঘের সংঘবদ্ধ জীবন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৩৩-৪২)

আমরা ভ্রাতৃসমাজের মিলন বন্ধনে বাস করি। আমরা একা নই, সেবাকাজও একা করি না। আমাদের কাজ ব্যক্তিগত পেশাগত চাকরী নয়; সংঘজীবন মিশনকাজে আমাদের সাহস ও শক্তি দেয়, আমাদের ভার লাঘব করে। সংঘে আমাদের ভাইদের ভালবাসায় আশ্রম-গৃহে বাস করি; পারস্পরিক সাহচর্যে ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দরিদ্রতা, কৌমার্য এবং বাধ্যতার ব্রত অনুশীলন করি। প্রেরণকাজের প্রয়োজনে ও স্বাস্থ্যগত কারণে এর ব্যতিক্রম হতে পারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে।

রোগ-শোকে, জীবনের অবসরে ও বার্ধক্যে আমাদের ভাইদের ভালবাসা ও যত্নে, তাদের প্রার্থনায় বলশালী হয়ে জীবনযাপন করি এবং মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমার ভাইয়েরা আমাদের পাশে আছেন। আমাদের আশ্রম-গৃহে বা স্থানীয় সমাজে একজন সুপিয়রের পরিচালনায় আমরা আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করি, জীবন ও সেবাকাজ পর্যালোচনা করি, প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে হাউজের কল্যাণ অনুসন্ধান করি; প্রার্থনা, চিত্তবিনোদন, অধ্যয়ন ও নির্জন ধ্যানসভা করার সুযোগ গ্রহণ করি এবং এভাবে আমাদের সংঘজীবন অনুশীলন করি সংঘের তৃণমূল পর্যায়ে।

আমাদের জীবনযাত্রা হবে ঐশরাজ্যের কারণে অনাড়ম্বর – সবাই তা দেখতে চায়। একদিকে সংঘের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি আবার অপরের প্রতিও আমরা উদার ও অতিথিপরায়ণ হই। সংঘের ভাইদের সাথে আমাদের ভালবাসাই হবে অন্যদের প্রতি উদারতার মাপকাঠি। সংঘজীবনে হতে পারে দোষ-দুর্বলতার জন্য অন্যের কষ্টের কারণ হই; মনোমানিল্য, মতবিরোধ, মতানৈক্য আসতে পারে, তবে নম্র হয়ে দোষ স্বীকার ক'রে, ভ্রাতৃপ্রেমের তাগিদে সংশোধন ক'রে এবং পুনর্মিলন ক'রে আমাদের সংঘজীবনের সাধনা করি। আমাদের দেখে অন্যেরা যেন বলতে পারে: "দেখ তারা পরস্পরকে কত ভালবাসে"।

॥ ৫ ॥ আত্মোৎসর্গ ও অঙ্গীকার: সংঘের সন্ন্যাসব্রতী জীবন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৪৩-৫৫)

আমাদের কৌমার্য, দরিদ্রতা এবং বাধ্যতা হচ্ছে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতি আমাদের আত্মদান, যিশুকে অনুসরণ করার জন্য জীবন উৎসর্গ, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, আস্থা ও অন্তরঙ্গতার প্রকাশ। তাছাড়া যিশুর মিশনকর্মের জন্য আমরা ব্রতগুলি গ্রহণ করি। কৌমার্যব্রতের দ্বারা ঐশপ্রেমের নিদর্শন, দরিদ্রতাব্রত দ্বারা দরিদ্র

মানুষের সাথে একাত্মতা এবং বাধ্যতাব্রতের দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করি। তিনটি ব্রতের মাধ্যমে আমরা জনগণের কাছে সাক্ষ্যদান করি যেমন জনগণও তাদের পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের ব্রতগুলো জগতের কাছে প্রাবক্তিক নিদর্শন স্বরূপ হয়ে ওঠে। "আমরা কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসজীবন এমন ভাবে যাপন করতে চাই যেখানে ভোগ-লালসা, ধন-সম্পত্তি এবং ক্ষমতা প্রভৃতি জাগতিক মোহ বা আকর্ষণের স্থান নেই"। প্রবক্তাদের মতো অনুরূপ সাক্ষ্যদান করতে পারি, তাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

কৌমার্যব্রত দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলন লাভের সাধনা করি এবং ভাইদের সাথে আমাদের ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও সাহচর্য গভীর করি। দরিদ্রতার ব্রতের মাধ্যমে আমরা কোন সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করার ইচ্ছা ত্যাগ করি এবং সংঘের সম্পদ সংঘের সর্বসাধরণের সম্পদ বলে গণ্য করি। বাধ্যতাব্রতের মাধ্যমে সংঘের কর্তপক্ষ এবং মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা পালন করার এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার অঙ্গীকার করি। বাধ্যতাব্রত দ্বারা আমরা সংঘ-ভ্রাতাদের ইচ্ছা আবিষ্কার করি এবং "উপাসনা, পালকীয় সেবাকাজ, এবং ঐশরাজ্যের জন্য কাজকর্মে আমরা বিশপগণের পালকীয় নির্দেশের অধীন" হয়ে থাকি।
আমরা আমাদের উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করি বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কৃষ্টিতে উপযোগী ও অর্থবহ করে। "সংঘের প্রতীক যে ক্রুশ ও নোঙর, তাই হচ্ছে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্যদের পরিচয়-চিহ্ন"।

॥ ৬ ॥ গঠন ও রূপান্তরঃ সংঘের শিক্ষা ও জীবন-গঠন (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৫৬-৭৯)
প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের মনোয়ন করেছেন এবং তাদেরকে গঠন দান করেছেন। গঠন দিতে গিয়ে তিনি ঐশরাজ্যের রহস্যময় সত্য ব্যাখ্যা করতেন, শিষ্যদের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য শুনতেন যাতে তারা ঐশরাজ্য প্রচার করতে পারে। পরবর্তীতে তিনি তাঁর আত্মাকে দান করেন যিনি যথাসময়ে তাঁর শিষ্যদের সবকিছু স্মরণ করিয়ে দেবেন ও শিখিয়ে দেবেন। সেই একই গঠন যেন আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে পাই তার ব্যবস্থা সংঘ গ্রহণ করে। ব্রতের মধ্য দিয়ে যা আমরা উচ্চারণ করি তা আমরা অভ্যাস, চরিত্র, মনোভাব, কামন-বাসনায় আজীবন সাধনা করি। আমাদের গঠনের যাত্রা শুরু হয় দীক্ষাস্নানের মুহূর্ত থেকে এবং তার সমাপ্তি ঘটবে একমাত্র পুনরুত্থানে। "আমরা নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবো তখনই, যখন আমরা বলতে পারব, আমি যে বেঁচে আছি এ-তো আমি নই, স্বয়ং খ্রিস্টই আমার মধ্যে বেঁচে আছেন"।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্য হিসেবে আমাদের কাছে অনেক দাবি আসে। কিন্তু এই দাবিগুলো আমাদের কাছে নিরানন্দ হয়ে আসে না। আমরা প্রফুল্লচিত্তে সেই দাবি পূরণ করি। আহ্বানে আমাদের আনন্দ আমরা অপরের সাথে সহভাগিতা করি।

প্রার্থী হিসেবে যারা সংঘে প্রবেশ করতে চায় আমাদের কাছে তাদের প্রাপ্যঃ পরিপক্কতা, বিশ্বাস, উদারতা, জ্ঞান এবং ভ্রাতৃসংঘে বাস করার জন্য সহায়তা। নবিসরা, "ধ্যান ও প্রার্থনায়, পরস্পরিক সেবা, প্রৈরিতিক সেবাকাজে এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতা, বিশেষত্ব ও প্রেরণকর্মে সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে নিজেদের গঠন করতে পারে"। "নব্যাশ্রম হল কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতায় তাদের শিক্ষানবিসির কাল"। সংঘের গঠন ও রূপান্তরের কাল প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে আজীবন তা চলমান থাকে। পালকীয় দায়িত্ব পালনে এবং প্রৈরিতিক কাজের জন্য চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় গঠন চলমান থাকে। জীবনভর গঠনের জন্য অতি প্রয়োজন মন-পরীক্ষা, পুনর্মিলন সংস্কার, আধ্যাত্মিক পরামর্শ, অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন, সহভাইদের প্রেরণাদায়ক চ্যালেঞ্জ এবং সংবেদনশীল উৎসাহ। "গঠন-প্রশিক্ষণ ও রূপান্তর স্বয়ং প্রভুরই দান।" এই দান লাভ করতে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি।

॥ ৭ ॥ কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বঃ কর্তৃপক্ষের সেবা এবং সদস্যদের দয়িত্বশীলতা (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ৮০-১১১)
"আমাদের জীবনযাত্রা যাতে মঙ্গলসমাচার অনুযায়ী হয় এবং আমাদের সেবাকাজ যাতে খ্রিস্টের প্রেরণকাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সে জন্য আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হতে হবে"। অন্যের কল্যাণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা বাধ্যতাব্রতেরই দাবি।

কর্তৃপক্ষের পরিচালনা সংঘের একটি সেবাকাজ। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে সংঘকে সেবা করার দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষ যে-পর্যায়েই তা হোক-না-কোন, তিনি কিন্তু একজন পালক এবং তাঁর দায়িত্বটাও পালকীয় দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষ সংঘের আত্মিক দান এবং ব্যক্তির আত্মিক শক্তির ওপর তিনি সভাপতিত্ব করেন। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করার জন্য আছে মন্ত্রণা-পরিষদ। তারা একটি সংঘবদ্ধ দল হিসেবে কাজ করেন সংঘের মঙ্গলের জন্য। কিছু কিছু দায়িত্ব আছে প্রধান কর্তৃপক্ষ একা করেন, আবার কিছু কিছু দায়িত্ব আছে যার জন্য প্রধান কর্তৃপক্ষকে মন্ত্রণা-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন ভাবে মন্ত্রণা-পরিষদ নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারে, তবে যখন তারা পরিষদের সদস্য হয় তখন তারা সবাই এক, তাদের লক্ষ্য সংঘের সাধারণ কল্যাণ।

সংবিধান ও অনুশাসনের নীতি অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব পালন করে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের চ্যাপ্টার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ রূপে অনুশাসন মোতাবেক কাজ করে। ভোটাধিকার সংবিধান ও অনুশাসনের বা চ্যাপ্টারের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

"সরলচিত্তে এবং বাধ্যতার মনোভাব নিয়ে সংঘের সকল সদস্য এসব সংবিধান পালন করে প্রভুর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা এবং পবিত্র ক্রুশ পরিবারে তাদের ভ্রাতৃত্ব যথার্থ ও মূর্ত করে তুলবেন"।

॥ ৮ ॥ ক্রুশই আমাদের প্রত্যাশাঃ সংঘের মূলমন্ত্র (সংবিধান অনুচ্ছেদ নং ১১২-১২৩)
আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল মেরী মরোর চোখের সামনে ছিল ক্রুশমূর্তি এবং মূলমন্ত্র হিসেবে সংঘকে দিয়েছেনঃ "স্পেস ইউনিকা" – "ক্রুশই আমাদের একমাত্র আশা"।

যিশুর শিক্ষা অনুসারে আমাদের প্রত্যেককে আপন ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে যিশুকে অনুসরণ করতে হবে। যিশু যেমন মানুষের পাপের ফল ও জীবনের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে মানুষের দুঃখকষ্টের সাথেও একাত্ম হই। ন্যায্যতার জন্য কাজ করতে গিয়ে, দুঃখভোগীদের সাথে একাত্ম হতে গেলে, তাদের পক্ষ নিতে গেলে আামাদের জীবনে আসবে দূঃখকষ্ট। এমনকি ভ্রাতৃসংঘে জীবনযাপন করতে গেলেও আমাদের জীবনে দুঃখকষ্ট আসে তা আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

তবে আমাদের জীবনে ক্রুশ থাকলেও আমরা আশা হারাই না; প্রত্যাশা নিয়ে পথ চলি। আমাদের প্রত্যাশা মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা জাগায়। জীবনের ব্যর্থতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে, অপমান আশীর্বাদ হয়ে আসতে পারে, রাগ-ক্রোধ নম্রতায় উপশমিত হতে পারে, কঠিন সময় শুভ সময় হয়ে আগমন করতে পারে; ক্রুশ আসতে পারে দান রূপে এবং ক্রুশে মৃত্যু নিয়ে আসতে পারে পুনরুত্থান – এই প্রত্যাশায় আমরা প্রত্যাশী।
ক্রুশতলায় মা মারীয়া, তিনি শোকার্ত জননী, আবার তিনি আমাদের প্রতিপালিকা। ভক্তি-আপ্লুত অন্তঃকরণ নিয়ে আমরা তার সন্তানেরা যখন তাঁর কাছ যাই তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্রুশ ও তার নৈমিত্তিক প্রত্যাশার কথা বুঝিয়ে দেন। "একবার যে-প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান সমভাবে সুনিশ্চিত"।

আমাদের আগে যারা এই পথ ধরে চলে গেছেন তাঁরা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন। "তাঁরা ধীরে ধীরে পথ চলেননি, চলেছেন দ্রুত পদক্ষেপে। কেননা তাঁদের মনে ছিল প্রত্যাশা"। যিশু তাদের যেমন ডেকেছিলেন, আমাদেরকে তিনি ডাকেন: "এসো, আমাকে অনুসরণ কর"।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা: পবিত্র আত্মায় অবধারণ

সাম্প্রতিকালে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যটি পোপ মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন সেটা হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী; "সিনড" কথার অর্থ হচ্ছে "একসঙ্গে পথচলা"। মণ্ডলীতে সবার "অংশগ্রহণ", মণ্ডলীর "মিশন" সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে, মণ্ডলী যেন "মিলন-সমাজ" হওয়ার জন্য সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা – ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও বিশপগণ "একসঙ্গে পথ চলেন"।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বে আমরা প্রত্যাদেশ গ্রন্থ থেকে এই বাণী শুনি: "যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।"

কাথলিক মণ্ডলী "এক" বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে এই "এক"-এর মধ্যে আছে "বহু"। মণ্ডলীতে আছে বহু কৃষ্টি, ভাষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, দেশ ও যুগ; বহু ধরনের মানুষ, তাদের বহু ধরনের শক্তি, ভূমিকা, দায়িত্ব; বহু মন-মেধা, চিন্তাধারা, হৃদয়বৃত্তি, মতামত ও সামর্থ। তবে "বহু"র মধ্যে রয়েছে "প্রভু" যিনি এক, বিশ্বাস যা "এক", পবিত্র আত্মা যিনি "এক", খ্রিষ্টদেহরূপ মণ্ডলীর বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনিই একমাত্র "প্রাণ"। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট করতে হলে পবিত্র আত্মাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরপুত্র প্রভু যীশুখ্রিষ্টেতে সবাইকে "এক" করেন, আমাদের সবাইকে "এক" পিতার সন্তান করে রাখেন। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

একারণেই পবিত্র আত্মার আগমন পর্বে (পঞ্চাশত্তমী পর্বে) আমরা মণ্ডলীর জন্মদিন পালন করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই মণ্ডলী জন্ম লাভ করে, আবার মণ্ডলী যা, তা-ই হয়ে ওঠে। মণ্ডলী যদি সত্তাগত ভাবে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে হয় তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তি, কাজ, প্রেরণা ও মিশন ছাড়া সম্ভব নয়। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

পোপ মহোদয় বলেছেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা হবে "শ্রবণ করা"; "ঐশ আত্মা কী বলছেন" তা শ্রবণ করা; আমার কাছে পবিত্র আত্মা কী বলছেন তা শ্রবণ করা; পবিত্র আত্মা অন্যের কাছে কী বলছেন তা শ্রবণ করা; মণ্ডলীর মধ্যে যেন কেউ মনে না করেন যে, কেবলমাত্র তার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেন। পবিত্র আত্মাকে সবাই লাভ করেছেন। তারা দীক্ষিত ও প্রেরিত।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে শুধু নিজের কথা শোনা নয়, পবিত্র আত্মা আমার মধ্য দিয়ে এবং অন্যের মধ্য দিয়ে কী বলছেন তা শ্রবণ করা। এর ফলেই মণ্ডলীতে গুরুত্ব পাবে আত্মার শক্তি দ্বারা জানার প্রক্রিয়া, যাকে আমরা বলি "আত্মায় অবধারণ শক্তি"।

আত্মায় "অবধারণ" হচ্ছে আত্মার একটি শক্তি। "অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা জানি, বিবেচনা করি, যাচাই করি, পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে কী বলছেন।

“আত্মায় অবধারণ শক্তি” দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যাকিছু ভাল বা মন্দ আছে তা আমরা জানতে পারি; “আত্মার অবধারণ শক্তি” দ্বারা অন্যের মধ্যে যাকিছু ভাল বা মন্দ আছে তা জানতে পারি; আত্মায় অবধারণ শক্তি দ্বারা নিজেদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে যা ভাল, অথচ গোপন আছে, তা বের করে আনতে পারি।

“আত্মায় অবধারণ শক্তি” দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পবিত্র আত্মার কাজ কোনটি এবং পবিত্র আত্মার বিরোধী কাজ কোনটি; কোন কাজটি শয়তানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে বলেন? যাকিছু “ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম”, (গালাতীয় ৫:২২-২৩); ঐক্য-মিলন, ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান, সমঝোতা, সংলাপ, সংহতি, স্বার্থচিন্তা-মুক্তি, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে – তাই পবিত্র আত্মার কাজ।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে নিষেধ করেন? “ব্যাভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব” (গালাতীয় ৫:১৯-২১), মিথ্যা-অপবাদ দেওয়া, দুর্নাম করা, সুনাম নষ্ট করা, বিরূপ সমালোচনা করা, স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কাইকে হেয় করা, কারো চরিত্র হনন করা, ধুমকি-ধামকি দেওয়া, ক্ষমতা প্রদর্শন করা, সত্যতা যাচাই না করে অসত্য প্রচার করা, ইত্যাদি কাজ সকল পবিত্র আত্মার পরিপন্থী। এগুলো কোন সময়ে পবিত্র আত্মার কাজ হতে পারে না।

ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন তা শ্রবণ করা ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে; শ্রবণ করা অন্যের মতামত জানার মাধ্যমে; ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও মাণ্ডলিক ভাবে আত্মায় অবধারণ শক্তির মাধ্যমে। “যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।”

পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ ক’রে অনেক আছেন যার সৎসাহস, সুবিবেচনা, ন্যায়পরায়নতা ও মিতাচারিতা নিয়ে, অন্যকে কঠিন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা দৃঢ়প্রত্যয়ী, মানুষের কথা না শুনে তারা ঈশ্বরের কথা শোনে, তারা নিজের মধ্যে কষ্ট থাকলেও শান্তি অনুভব করে, ভুলের সংশোধন তারা গ্রহণ করতে পারে, ভুল করলে তারা ক্ষমা চাইতে পারে এবং অপরকে ক্ষমা করতে পারে। তারা শান্তিকামী, তারা ধন্য। শান্তি পবিত্র আত্মারই দান।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ার প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মায় অবধারণ শক্তি দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জেনে, যা-কিছু করণীয় তা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এসো আমরা আমাদের মাতা মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী গড়ার কাজে নিয়োজিত হই। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী নির্মাণ করার প্রক্রিয়ায় এসো আমরা পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা অবধারণ প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে পথ চলি এবং জানতে চেষ্টা করি “ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।” এটাই হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা যেখানে আছে আত্মার ঐক্য, মিলন, সক্রিয়তা ও মিশন সম্পাদনের দৃঢ় চেতনা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি
পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব – ২০২২।

জুন মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য:

যারা নিজ দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য প্রার্থনা।

আমরা প্রার্থনা করি: যারা যুদ্ধ ও অভাব-অনটনের কারণে অভিবাসী হয়ে আপন দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাচ্ছে, নানা বিপদ ও সহিংসতার শঙ্কায় যাত্রা করতে বাধ্য হচ্ছে, তারা গন্তব্য-দেশে পৌঁছালে সাদরে গৃহীত হতে পারে এবং নতুন ভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করতে পারে।

বিশ্বের মধ্যে প্রায় ২৮.১ কোটি মানুষ শরণার্থী এবং ১১ কোটি মানুষ আপন দেশের মধ্যে এক স্থান ছেড়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে বসবাস করছে। অনেকেই যুদ্ধ, ধর্মীয় নির্যাতন, জাতি-বৈষম্যের কারণে শরণার্থী হয়; আবার উন্নত জীবনের আশায় অনেকে অভিবাসী হয়।

আমাদের দেশের মধ্যে অনেকেই আছে বাইরের দেশ-থেকে-আসা শরণার্থী, আছে অভ্যন্তরীণ শরনার্থী, আবার আছে বিদেশে চলে যাওয়া অথবা বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অভিবাসী।

পোপ ফ্রান্সিসের মতামত হচ্ছে: শরণার্থীরা বা অভিবাসীরা যে দেশে যাচ্ছে সেই দেশ যেন (ক) তাদেরকে গ্রহণ করে, (খ) তাদেরকে রক্ষা করে, (গ) তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং (ঘ) তাদেরকে দেশের মধ্যে আপন করে নেয়। পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "যারা অভিবাসীদের গ্রহণ করে তার খ্রিস্টকে গ্রহণ করে।"

তাই এসো, আমরা শরণার্থী ও অভিবাসীদের জন্য প্রার্থনা করি। তারা যেন উন্নততর মানবিক জীবনের সন্ধান পায়। পবিত্র যিশুর হৃদয় – আমাদের প্রতি সদয় হও।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও
পহেলা জুন, ২০২৪ খ্রি.

বাণী

প্রথমেই মহান করুণাময় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাদের ভালবাসায় আশ্রয় দিয়ে ভাল রেখেছেন। বিশেষভাবে আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাকে 'ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল'র মতো মহৎ কর্মযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ দিয়েছেন। আজ হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আমি আনন্দিত।

দেশের প্রথম সমবায়ীদের হাসপাতাল 'ডিভাইন মার্সি হাসপিটাল লি:' -এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত সুখানুভব করছি। আমি হাসপাতালটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশের ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুলাই বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ও বৃহৎ ক্রেডিট ইউনিয়ন (সমবায় প্রতিষ্ঠান) 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট

ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লীসহ সারা দেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ফাদার ইয়াং -এর এই ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ঢাকা ক্রেডিট সমিতির সদস্যসহ আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার মঠবাড়ীতে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট 'ডিভাইন মার্সি হাসপিটাল লি:' প্রতিষ্ঠা করেছে যা দেশের সমবায়ের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। শোনা যাচ্ছে হাসপাতালের পাশাপাশি একই ক্যাম্পাসে নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমি ঢাকা ক্রেডিট কর্তৃক এসব উদ্যোগের প্রশংসা করছি।

২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন ঢাকা ক্রেডিট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ আমার সাথে আলোচনা করেন। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল হাসপাতালটির নাম কী হতে পারে। কাথলিক মণ্ডলীতে যেহেতু ঐ বছর "ডিভাইন মার্সি" বর্ষ পালিত হচ্ছিল তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললাম নামটি হবে: "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল"। এই নামের মধ্যে আমি প্রথমে এই উপলব্ধি করি যে, রোগ-নিরাময় পরমেশ্বরের ভালবাসা ও দয়ারই প্রকাশ; দ্বিতীয়ত, ডিভাইন শব্দটি সবধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। তৃতীয়ত, আমরা সর্বধর্মের মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে দয়াবান, করুনানিধান, রহমতুল্লাহ ও করুণাময় পরমেশ্বর বলে ডাকি। চতুর্থত, সর্বধর্মের আধ্যাত্মিকতার নির্যাসের ওপর ভিত্তি করে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠিত হবে; আর পরিশেষে হাসপাতালটি আমাদের মাঝে হয়ে উঠবে দয়াশীল করুণাময় পরমেশ্বরের একটি দৃশ্যমান নিদর্শন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ঐতিহাসিকভাকে হাজারো বছর ধরে এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান জনগণ সম্প্রীতির বন্ধনে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এ দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, উন্নয়ন, সমবায়, বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে এ সম্প্রদায়ের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষও সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আজ আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত যে, তার সুযোগ্য কন্যা, আমাদের অতি আপনজন, জননেত্রী শেখ হাসিনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল"টি উদ্বোধন ক'রে খ্রিস্টান সমাজকে আবারও একবার স্বীকৃতি প্রদান ক'রে আমাদেরকে বাধিত করেছেন। পরম করুণায় প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন ও তাঁর মঙ্গল করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডাইয়োসিস।
২রা জুন, ২০২৪

বাণী

ঈশ্বরের মহান দয়া ও আশীর্বাদ আমাদের কাছে বিভিন্ন ভাবেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। মাউছাইদ ধর্মপল্লীর নব নির্মিত উপাসনা মন্দিরটি তারই এক দৃশ্যমান প্রতীক। এই মন্দিরটির আশীর্বাদ ও শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত "স্মরণিকা"এর মাধ্যমে সকলকে জান্যই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

নবনির্মিত গির্জা ঘরটি আশীর্বাদ এবং খ্রিস্টযাগ-অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার অনুরোধ জানালেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও। আমি তখন বেশ বিস্মিত হলাম। পরবর্তীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিজয় এন ক্রুজ, ওএমআই সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলাম যে, তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ধর্মপল্লীর সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করেই। আমি আর্চবিশপ মহোদয়কে অনুরোধ

করেছিলাম যেন তিনি পৌরহিত্য করেন, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাই আমি শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় মহোদয় এবং পালপুরোহিত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টজনদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রাক্তন ধর্মপাল হিসেবে, ধর্মপ্রদেশের মন্ত্রণা-পরিষদ এবং মাউছাইদ ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ও ভক্তজনগণ এবং তৎকালীন সদ্য নব-প্রতিষ্ঠিত পাগাড় ধর্মপল্লীর পূর্বতন নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্ম হয়ে এই গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আমি আনন্দের সাথে স্মরণ করি সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দ এবং সেই সমস্ত সংগঠন যারা আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন নির্মাণ-অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমার জানামতে তারা তাদের সামর্থ অনুসারে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমান আর্চবিশপ সেই ব্যয়বহুল কাজটি সহৃয়ে সম্পন্ন করেছেন।

গির্জাঘর মানুষের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং প্রভু যিশুর মাধ্যমে তাঁর দৃশ্যমান প্রকাশ। গির্জা একটি পুণ্য পবিত্র স্থান। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও পুণ্য ভালবাসা উপলব্ধির এক বিশেষ স্থান। গির্জা হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরব, প্রশংসা ও আরাধনা করার স্থান, প্রার্থনার স্থান।

নব নির্মিত ও আশীর্বাদিত এই উপাসনা মন্দিরটিতে সুন্দর পরিবেশে ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী একসাথে প্রভুর ভোজে মিলিত হবে এবং প্রভু যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে ভক্তজন নিজেদের জীবন যজ্ঞরূপে নিবেদন করবে। যার ফলে তারা দীক্ষাস্নানে পাওয়া যাজকত্বের মর্যাদা রক্ষা এবং অনুশীলন করতে পারবে। তারা প্রার্থনা করবে এবং পবিত্র সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করবে। নিয়মিতভাবে ভক্তজনগণ ঐশবাণী শুনবে এবং সেই বাণীর আলোকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবনযাপন করে সকলের জীবন হয়ে উঠবে পবিত্রাত্মারই মন্দির (১ করিন্থীয় ৩: ১৭)।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মহোদয়ের আন্তরিকতা, ধর্মপ্রদেশের সকল যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ, মাউছাইদ ধর্মপল্লীর বিগত ও বর্তমান পাল-পুরোহিতগণ, ভক্তজনগণ এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। ধর্মপল্লীবাসী, তোমরা সবাই মিলে হয়ে ওঠো পরমেশ্বরের মন্দির, পবিত্র ও মনোনীত জাতি এবং রাজকীয় যাজকসমাজ। প্রভু যিশু তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ অব ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ সবসময় শুভ সুন্দর ও কল্যাণের পক্ষে কাজ করে চলেছে গত ৫০টি বছর। ১৯৭৪ খ্রীঃ ৭ জুলাই জন্মের পর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলা ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ আজ সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্রতা বিমোচন ও সৃজনশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যয়ে রূপান্তরিক জীবনের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমার বিশ্বাস ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ সেবার কাজে আদর্শ ও চেতনায় উন্মোচিত হয়ে ঐতিহ্য প্রদর্শন গতিময় স্বকীয়তায় ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করে চলেছে। যুগে যুগে হাজার হাজার অসহায় মানুষ, সমাজের বঞ্চিত এবং প্রান্তিক মানুষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতি।

ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ শব্দটির মধ্যেই রয়ে গেছে এমনই একটি বৈশিষ্ট্য, যা' অনন্য। কেননা এর মূল শক্তি ঈশ্বরের আশীর্বাদ; একটি অবয়ব যাতে আছে নতুন ঐশ্বরীক আশীর্বাদ, অসহায় শিশুকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয়; যার মধ্যে আছে ঐশ্বরিক প্রেমের স্রোতস্বিনী, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে শক্তিময়, সেবার প্রবল উন্মাদনা, মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যগ্র, ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, প্রগতিশীল কাজে দীর্ঘায়ুর পথে, বিনয়ী উপস্থাপনা ও মহিমা বদান্যতায় অবিচল আস্থা। তাই আমি ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ এর মধ্যে ঈশ্বরের গৌরব উপলব্ধি করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, স্বপ্নদর্শী-দূরদর্শী স্বর্গীয় রেভাঃ স্মীথ আর. অধিকারী ও ড. রে. হেরিসনকে; যাদের অবদান আমরা ভুলবো না। নগর-মহানগরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের দেশের উন্নয়নে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় ভূমিকা রেখে চলেছে গত ৫০টি বছর। মাদার তেরেসা বলেছেন, *'আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি। প্রভু, আমাদের যোগ্য করো, যেন আমরা সারা পৃথিবীতে যেসব মানুষ দারিদ্রের মধ্যে, ক্ষুধার মধ্যে জীবনযাপন করেন, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের সেবা করতে পারি। কেবল সেবা নয়, মানুষকে দাও তোমার হৃদয়। হৃদয়হীন সেবা নয়, তারা চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ। আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট ছোট কাজ করতে পারি আমাদের ভালোবাসা দিয়ে। আনন্দই প্রার্থনা, আনন্দই শক্তি, আনন্দই ভালোবাসা।'*

আমার বিশ্বাস, প্রভুর গৌরব বহন করতে করতে কর্মের মধ্যদিয়ে সমাজের অসঙ্গতি ও দরিদ্রতার বৈষম্য দূর করতে সক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ হতদরিদ্র মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সফল। ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ এর সেবার কাজ অবলুপ্ত হবে না; সেবার আদর্শ বিরাজিত সর্বত্র, সর্বজনীন ও গতিময় শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই; এমনি আরো এগিয়ে চলার প্রত্যাশা সকলের। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ এর গৌরবোজ্জল ভূমিকা, আগামী দিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক, সেবার প্রত্যয়ে যুগ যুগ ধরে আয়ুবৃদ্ধি ঘটুক, অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ভরে উঠুক-এটাই কামনা করছি। আশীর্বাদান্তে,

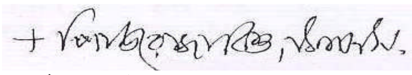

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
অবসরপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ

'ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল'র উদ্বোধন উপলক্ষে বাণী

প্রথমেই মহান করুণাময় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি তাঁর ভালবাসায় আশ্রয় দিয়ে আমাদেরকে ভাল রেখেছেন। বিশেষভাবে আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাকে 'ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল'র মতো একটি খ্রীস্টীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ দিয়েছেন। আজ হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আমি আনন্দিত।

দেশের প্রথম সমবায়ীদের হাসপাতাল 'ডিভাইন মার্সি হাসপিটাল লি:' -এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে একটি 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত সুখানুভব করছি। আমি হাসপাতালটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশের ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুলাই বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ও বৃহৎ ক্রেডিট ইউনিয়ন (সমবায় প্রতিষ্ঠান) 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লীসহ সারা দেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ফাদার ইয়াং -এর এই ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ঢাকা ক্রেডিট সমিতির সদস্যসহ আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার মঠবাড়ীতে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট 'ডিভাইন মার্সি হাসপিটাল লি:' প্রতিষ্ঠা করেছে যা দেশের সমবায়ের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। শোনা যাচ্ছে হাসপাতালের পাশাপাশি একই ক্যাম্পাসে নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমি ঢাকা ক্রেডিট কর্তৃক এসব উদ্যোগের প্রশংসা করছি।

২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন ঢাকা ক্রেডিট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ আমার সাথে আলোচনা করেন। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল হাসপাতালটির নাম কী হতে পারে। কাথলিক মণ্ডলীতে যেহেতু ঐ বছর "ডিভাইন মার্সি" বর্ষ পালিত হচ্ছিল তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললাম নামটি হবে: "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল"। এই নামের মধ্যে আমি প্রথমে এই উপলব্ধি করি যে, রোগ-নিরাময় পরমেশ্বরের ভালবাসা ও দয়ারই প্রকাশ; দ্বিতীয়ত, ডিভাইন শব্দটি সবধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। তৃতীয়ত, আমরা সর্বধর্মের মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে দয়াবান, করুনানিধান, রহমতুল্লাহ ও করুণাময় পরমেশ্বর বলে ডাকি। চতুর্থত, সর্বধর্মের আধ্যাত্মিকতার নির্যাসের ওপর ভিত্তি করে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠিত হবে; আর পরিশেষে হাসপাতালটি আমাদের মাঝে হয়ে উঠবে দয়াশীল করুণাময় পরমেশ্বরের একটি দৃশ্যমান নিদর্শন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ঐতিহাসিকভাকে হাজারো বছর ধরে এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান জনগণ সম্প্রীতির বন্ধনে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এ দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, উন্নয়ন, সমবায়, বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে এ সম্প্রদায়ের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষও সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। পরম করুণায় প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন ও তাঁর মঙ্গল করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, ঢাকা আর্চডাইয়োসিস।

Dear Brothers of Holy Cross
St. Joseph Province
Bangladesh.

It is with immense joy I greet you all on the occasion of the 25 Year Anniversary of foundation of the Province of St. Joseph in Bangladesh.

As the-then District Superior of the Fathers of Chittagong District, I remember the journey, we Brothers and Fathers of Holy Cross of the Districts of Chittagong and Dhaka, have made from the status of Districts to Vice Provinces and then to the full-fledged Provinces that was born twenty five years ago.

At the time of erection of St. Joseph Province, it was a sign of maturity and young adulthood that the Brothers of Holy Cross in Bangladesh have achieved.

Now after twenty five years, the province has really grown up to the full adulthood which is visible in the maturity of the Holy Cross Brothers, in being a giving community with missionary outreach, in the increase of its

membership and in the expansion of its presence at home and abroad with diverse ministries.

You have many reasons to celebrate and I join you in the celebrations as a confrere of the Community by praising and thanking the Lord, expressing gratitude to you all, and praying to the Lord for all the good things that you would like to have. May St. Joseph protect you and guide you.

Cardinal Patrick D’Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল: আসাদগেট থেকে মঠবাড়ি

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি.

এই লেখার শিরোনামটা দেখে খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আসলে সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, আবার সেই প্রতিষ্ঠান যদি বড়ো হয়, তাহলে তার জন্মের সঠিক ক্ষণটাও বলা যায় না আর জন্মের স্থানটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের ব্যাপারেও বিষয়টা তাই।

বিভিন্ন জনার কাছে বর্তমান ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল-এর স্বপ্নটার শুরু বিভিন্ন স্থানে ও কালে হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি হাসপাতালের বিষয় অবগত হলাম সম্ভবতঃ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যখন ঢাকা ক্রেডিট তাদের এজিএম-এ প্রধান অতিথি হিসেবে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তৎকালীন ঢাকার আর্চবিশপ রূপে। তখন মাত্র দু’বছর পূর্বে ঢাকা আর্চডায়োসিসের দায়িত্বে নিয়োজিত হলাম। উক্ত এজিএম-অনুষ্ঠানে রিপোর্ট ও নানা বক্তব্যের মধ্যে শুনতে পেলাম যে, ঢাকা ক্রেডিট মেয়েদের জন্য একটা হোস্টেল এবং একটি হাসপাতাল শুরু করার পরিকল্পনা করছে। তাৎক্ষণিক ভাবে আমি অবাক হলাম এই ভেবে যে, হোস্টেল করা বা হাসপাতাল করার চিন্তা ও পরিকল্পনা সাধারণতঃ এ যাবৎ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ করে থাকেন। আর আমি একজন কর্তৃপক্ষ হয়ে বসে বসে শুনছি যে, মণ্ডলীর ভক্তজনগণ হোস্টেল ও হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

ঢাকা ক্রেডিটের পরিকল্পনা শুনে আমি একদিকে অবাক ও বিস্মিত হলাম এবং আমার মধ্যে সৃষ্টি হল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তাদের পরিকল্পনা শোনার সাথে সাথে আমি ভাবলাম মণ্ডলী আজ পরিপক্ক, ভক্তজনগণ নতুন স্বপ্ন দেখছে – কীভাবে তারা মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করবে, কী ভাবে মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করবে। আমি অভিভূত হলাম এ কারণে যে, ওরা মণ্ডলীর প্রচলিত চিন্তাধারাকে পাল্টে দিল। আমার নিজের চিন্তাধারার মধ্যে আসল নতুন পরিবর্তন, মণ্ডলীতে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখার একটি আবেদন অনুভব করলাম। সাথে সাথে ঐ অধিবেশনে বসে এটাও আমার ভাবনায় আসল ভক্তজনদের কী আস্পর্দা! কী সাহস! মনে মনে প্রশ্ন করলাম মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ ছাড়া ওরা এই চিন্তা করতে পারল? প্রধান অতিথির কক্তব্যের সময় যখন আসল তখন আমি আমার উপলব্ধি কিছুটা উপস্থিত হাজারো সদস্যের কাছে শেয়ার করলাম। মনে হচ্ছে পবিত্র আত্মা যেন আমাকে বলে দিল কী বলতে হবে। যা সবার উদ্দেশ্যে বললাম তা আজও আমার কানে বাজছে: “হোস্টেল ও হাসপাতাল নিয়ে তোমাদের স্বপ্নকে আমি সাধুবাদ জানাই। তোমরা মণ্ডলীর সম্পদ: তোমাদের আছে অর্থবল আর আছে জনবল। মনে রেখো, মাণ্ডলিক কর্তৃপক্ষের আছে আরেকটি বল। সেটা হচ্ছে খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতার বল যা তোমাদের অর্থবল ও জনবলের

সঙ্গে সংযুক্ত করে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সেই শক্তি নিয়ে তোমরা একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাও।" সেই দিন থেকে যারা ঐ সময়ে ঢাকা ক্রেডিটে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের দিকে তাকিয়ে ও তাদের প্রতি ঘনিষ্ঠ নজর রেখে আমি পরবর্তী বছরগুলোর পথ চলতে শুরু করলাম। ঐ সময় থেকে আমার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, মণ্ডলীর সম্পদ কিন্তু ভক্তজনগণের মধ্যে; তারাই সেই সম্পদের মালিক। তারা পারবে আধুনিক যুগে সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে। আমরা যারা কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আমাদের পথ চলতে হবে।

ইতিমধ্যে আবেদন আসল আসাদগেটে খ্রিস্টান হোস্টেলটির সংস্কার প্রয়োজন, বর্ধিত ও উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। ভূ-সম্পত্তির আরও যোগ্য ব্যবহার নিয়ে ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের পক্ষে আমরা চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। আমার পূর্বসূরী আর্চবিশপ পৌলুনিস কস্তাও খ্রিস্টান ছাত্রাবাসটি নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। খ্রিস্টান হোস্টেলের উন্নয়নের লক্ষ্য মাথায় রেখে, প্রায় তিনশত বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত করে ৮তলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল তৈরী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম। ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের মন্ত্রণা-পরিষদে আলোচনা করে আসাদগেটে অবস্থিত মূল্যবান জমি থেকে দুই-তৃতীয়াংশ হোস্টেলের জন্য বরাদ্দ রেখে, দশ শতাংশ জমি খ্রিস্টিনা প্যারিশের সাথে সংযুক্ত করা এবং আরেক দশ শতাংশ মণ্ডলীর ব্যবহারের জন্য একটি মাল্টিপারপাস দালান করার পরিকল্পনা অনুমোদিত হল।

এদিকে একটি বিদেশী দাতা-সংস্থা খ্রিস্টান হোস্টেল নির্মাণের জন্য অর্থ যোগান দিতে রাজি হল। তবে সংস্থাটি শর্ত দিয়েছিল যে, স্থানীয় একটি সংস্থা যেন তাদের সাথে সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। ডাইয়োসিসের অনুরোধে ঢাকা ক্রেডিট সহযোগী সংস্থা হওয়ার জন্য রাজি হল এবং ইতিমধ্যে হোস্টেল জন্য নির্ধারিত পরিমাণের টাকাও জমা দিল। ঢাকা আর্চডাইয়োসিস এবং ঢাকা ক্রেডিটের সঙ্গে সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এই শর্তে যে, ঢাকা ক্রেডিট-মাল্টিপারপাস বিল্ডিংটি নির্মাণ করবে তাদের নিজেদের অর্থায়নে এবং বিনিময়ে সেই বিল্ডিংটি একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তারা ব্যবহার করবে। উক্ত হাসপাতালের নাম আমি প্রস্তাব করেছিলাম "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল" কেননা ঐ বছর (২০১৬ খ্রি) গোটা মণ্ডলীতে "ডিভাইন মার্সি" বা "ঐশকরুণার বর্ষ" হিসেবে পালন করা। ইতিমধ্যে ঢাকা ক্রেডিট কিন্তু পূর্বেই পরিকল্পনা করেছিল যে, কয়েক বছরের মধ্যে মঠবাড়িতে আরও বড়ো আকারে হাসপাতালসহ নার্সিং কলেজ ও মেডিকাল কলেজ নির্মাণ করবে।

ঢাকা ক্রেডিটের সাথে আমি সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম প্রধানতঃ হোস্টেলের উন্নয়নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ ঢাকা শহরে মণ্ডলীর নিজস্ব জমির আরও উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য এবং তৃতীয়তঃ মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের সম্পদকে আরও অর্থপূর্ণ ও উপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য। তবে ডাইয়োসিসের এই পরিকল্পনায় কিছু সংখ্যক লোক একমত হতে পারেননি। হোস্টেলের সম্ভাব্য দাতা-সংস্থাও অপারগ হয়ে সরে গেল। আসাদগেটে হাসপাতাল করার স্বপ্ন থেকে ঢাকা ক্রেডিট দূরত্ব নিল। এ সবকিছুতে মণ্ডলীর সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য তা আমি জানি না। তবে এটা এখন সত্য যে, "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল" আজ মঠবাড়িতে স্থাপিত। স্বপ্ন একটি সময়ে হয় এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গা ঘিরেও তা হতে পারে কিন্তু তার বাস্তবায়ন সেই ক্ষণে বা সেই স্থানে না-ও হতে পারে।

পরম করুণাময়ের পরিকল্পনা অনুসারে "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল" আমরা পেয়েছি। আজ আমাদের সকল প্রশংসা পরম করুণাময়ের নিকট নিবেদিত। শ্রদ্ধেয় ফাদার ইয়াং, সিএসসি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান কোপাটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, এলটিডি, সংক্ষেপে ঢাকা ক্রেডিটের নিকট – তাদের সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাদের জন্য আমরা গর্বিত। ঢাকা ক্রেডিট ও তাদের সহযোগী ব্যক্তিবর্গ যারা স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন বাস্তব করে তুলতে যারা তাদের মেধা, সময়, শ্রম, অর্থ ও ত্যাগ নিবেদন করেছেন এবং আমাদের কাছে তা দৃশ্যমান করে তুলেছেন তাদের সকলে প্রতিও রইল আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন।

যে সৎসাহস ও বলিষ্ঠতা নিয়ে "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল" নির্মাণ করার যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, মণ্ডলীর নামে ও খ্রিস্টীয় আদর্শ অনুসরণে এবং ভালবাসা-যত্ন-মমতা-র মূল্যবোধে ব্রতী হয়ে আসুন, আমরা সকলে মিলে "ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল"টিকে পরম করুণাময়ের নিদর্শন করে আমাদের সেবাকাজে নিজেদেরকে নিবেদন করি।

নব-নিযুক্ত শ্রদ্ধেয় সুব্রত বনিফাস গমেজের অভিষেক উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী

নব-নিযুক্ত শ্রদ্ধেয় সুব্রত বনিফাস গমেজকে আমাদের সবার অন্তরের সকল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের সহকারী বিশপ হিসেবে ঈশ্বরের দান রূপে এবং কৃতজ্ঞমনে এই দানটি গ্রহণ করে, এবং প্রার্থনায় একাত্ম থেকে পালকের প্রতি আমাদের সবার আনুগত্য স্বীকার করছি।

একটি ডাইয়োসিসের ধর্মপাল নিয়োগের যে-প্রক্রিয়া মণ্ডলীতে আছে তা অবশ্যই স্থান-কাল বিবেচনায় যথাযথ। তবে সবকিছুর শেষে এটাই আমাদের কাছে নিশ্চিত যে এ কাজ পবিত্র আত্মার কাজ। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন পালককে সুনির্দিষ্ট আত্মিক শক্তি দিয়ে ধর্মপ্রদেশের সকল জনগণকে আধ্যাত্মিক পরিচর্যা দ্বারা পবিত্র করেন, শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের দ্বারা প্রাবক্তিক এবং পরিচালনা ও সেবার দ্বারা ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার রাজকীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

শ্রদ্ধেয় সুব্রত বনিফাস গমেজ-এর অভিষেক দিবসে, সাধু ফ্রান্সিস দ্য সালের কিছু কথা আমার মনে পড়ে। তিনি আবেদন জানিয়ে জনগণকে বলেছিলেন: *"আমি একান্ত অনুরোধ করি আপনারা আমার জন্য অনেক প্রার্থনা করুন; বিশ্বাস করবেন না, আমি এই বড়ো ও কঠিন দায়িত্বের ভার ও বোঝা কত কষ্টের সঙ্গে বহন করছি।"* আবার তিনি এ কথাটিও বলেছেন: *"ঈশ্বর যা ভালবাসেন, আমাদেরকেও তা ভালবাসতে হয়। ঈশ্বর তাঁর আহ্বান ভালবাসেন, এসো আমরাও আমাদের আহ্বানকে ভালবাসি।... আসলে আমার আহ্বানের কারণে আমি আমার দায়িত্ব কেবলমাত্র যে বাধ্য হয়ে পালন করছি তা নয়, আনন্দের সঙ্গেই তা পালন করছি; এতে আছে আমার পছন্দ ও তৃপ্তি।"* এই মুহূর্তে সাধু ফ্রান্সিস দ্য সালের এই কথাগুলো সবার অন্তরে অনুভূতি হয়ে উঠুক।

মঙ্গলসমাচারে যীশু পিতরকে জিজ্ঞেস করেন: "তুমি কি আমাকে ভালবাস?" প্রেরিতদূত পিতর এক সময় অতি প্রত্যয়ের সঙ্গে, এক সময় বড়ো ইতস্ততার সাথে, আবার একসময় খুবই নম্রভাবে ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে বললেন: "হ্যা, প্রভু, তুমি তো জান, আমি তোমাকে ভালবাসি"। আর যীশুর উত্তর সব সময় একই: "তাহলে আমার মেষদের দেখাশুনা কর"।

যিশু বলেন, "আমি প্রকৃত মেষপালক, আমি আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে" (যোহন ১০:১৪)। যিশু এলেন প্রকৃত মেষপালকরূপে। পালকরূপে যারা নিযুক্ত হন তাদের জন্য যিশুই উত্তম মেষপালক – তিনিই সকল পালকের আদি, প্রেরণা, আদর্শ ও ধ্যান। আজ বলা যায় নব-নিযুক্ত বিশপ সুব্রতের জন্য সত্য হল এই বাণী।

"আমি আমার মেষগুলিকে জানি"! যেহেতু বিশপ সুব্রত গমেজ ঢাকা আর্চডাইয়েসিসের একজন যাজক, সেহেতু তিনি আর্চডাইয়েসিসের মেষগুলিকে অনেকটা জানেন। এই জানাটা অতীতের একটি বাহ্যিক পরিচয় শুধু নয়। এটা একটি ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ পরিচয় যা আগামীতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালবাসায় আরও গ্রথিত ও একাত্মতায় বিকশিত হবে।

"আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে"! ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের নিকট বিশপ সুব্রত গমেজ সম্পূর্ণ অপরিচিত নন; তাঁর কণ্ঠস্বর অনেকে জানেন। এ জানাটা একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য এবং স্বাচ্ছন্দ প্রাপ্তি। তবে এই জানাটা এখন থেকে আরও গভীরতা লাভ করবে ভালবাসা, আনুগত্য, মিলন-বন্ধন ও একাত্মতায়।

আজকের এই অভিষেক অনুষ্ঠান, পালকের পবিত্রীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিচালন করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ এবং সেই একই দায়িত্বে ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সহ-দায়িত্ব পালনের জন্য কর্তব্যনিষ্ঠা, আনুগত্য ও বিনম্রতার একটি মৈত্রীসন্ধির উদ্‌যাপন হয়ে উঠুক।

শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বি. গমেজকে এবং আর্চডাইয়োসিসের সকল খ্রিষ্টভক্তজন, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকের জন্য আমার প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি হোক আমার প্রীতি উপহার, শুভেচ্ছা হোক আমার একাত্মতা, অভিনন্দন হোক আমার কৃতজ্ঞতা, এবং আনন্দানুভূতি হোক ভাবী প্রত্যাশা পূরণের আহ্বান। প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরা আশীর্বাদান্তে,

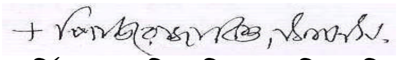

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
ঢাকার অবসর প্রাপ্ত আর্চবিশপ।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী সুবর্ণ জয়ন্ত্রী, ১৯শে এপ্রিল, ২০২৪।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারির সুবর্ণ জয়ন্তী :
স্থানীয় মণ্ডলী বিনির্মাণে গৌরবময় পঞ্চাশ বছর
খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

খ্রিষ্টেতে পিয়জনেরা,
১২৬ নং সামসঙ্গীতে আছে: "সত্যিই তো, আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাজ কতোই না বিচিত্র!
আর আমরাও তাই কত আনন্দিত ..
যারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বীজ বুনে যায়,
আনন্দের গান গাইতে-গাইতেই তারা ফসল তুলে আনে।"

এই কথাগুলো দিয়ে "পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারি: স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে গৌরবময় পঞ্চাশ বছর" পূর্তি উৎসবের খ্রিষ্টযাগে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সবাই আহ্বান করছি । পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারি সত্যিই ঈশ্বরের কাজ। তিনি অবশ্য ব্যবহার করেছেন অনেককে যারা চোখের জলে বীজ বপন করেছেন আর আজ আমরা আনন্দে তার ফসল সংগ্রহ করছি।

(প্রকাশিত স্মরণিকা: "পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী প্রতিষ্ঠার পূর্বকথা" নামে আমার একটি লেখা আছে এবং ইংরেজীতে আমার একটা শুভেচ্ছা বানীও আছে। ওখানে রচিত কথা না বলে আজকের শাস্ত্রপাঠে যেরেমিয়া: ৩:১৪-১৭; ১করি ১২:৪-১১; যোহন ১০:১১-১৮- এর *উপর ভিত্তি করে আমি আমার ধ্যান সহভাগিতা করছি।)*

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারির পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলী অবশ্যই গর্বের সাথে স্বীকার করবে যে, এই সেমিনারিটি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের একটি মহান কীর্তি এবং স্থানীয় মণ্ডলীর অতীব প্রাণের একটি প্রতিষ্ঠান।

পবিত্র আত্মা সেমিনারিটি পবিত্র আত্মারই একটি মহান দান। স্বাধীন বাংলাদেশের শুভ জন্ম-লগ্নে পবিত্র আত্মার এই দানটি বিগত পঞ্চাশ বছরের যাত্রাকালে অভিব্যক্ত হয়েছে বিচিত্র রূপে। আত্মারই পরিচালনে ও দেশের রূপ-রং ও

গন্ধ-রসে গঠিত হয়েছে মণ্ডলীর অন্তর, উদ্ভাবিত হয়েছে প্রাণের উৎসধারা যা প্রবাহিত হয়েছে সর্বত্র - দেশের ঘরে ও বাইরে; আর পরিভূষিত করেছে মণ্ডলীকে আত্মার বিচিত্র দানে, বহু সাজে, এবং চারশতাধিক সেবাকর্মী গঠনদানে।

আজকের দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে পলের কথায় তাই অতি স্বাচ্ছন্দে আমরা বলতে পারি: "বহু আত্মিক দান, কিন্তু দাতা যিনি, পবিত্র আত্মা তিনি এক। - "সমস্ত-কিছুই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ" – তাঁরই অভিপ্রকাশ। তাই আত্মারই অনুপ্রাণনে আমাদের অন্তর-হৃদয় ভরপুর, প্রভুর প্রশংসা-ধন্যবাদ ও আনন্দ-গানে প্রাণ আমাদের উচ্ছসিত, এবং আত্মার কর্ম-কীর্তিতে অবাক ও অভিভূত আমাদের অন্তর-চিত্ত। তাই আমাদের নিবেদন: হে পবিত্র আত্মন, গ্রহণ করো আমাদের বিনম্র ভক্তি-অঞ্জলি, এবং অর্ধশতাব্দির কৃতজ্ঞতার ডালি।

মঙ্গলসমাচারে যিশুর কথা শুনেছি: "আমি উত্তম মেষপালক"। যিশুর এই বাণীই ছিল প্রাণ-প্রিয় সেমিনারির বিরামহীন ও চলমান ভাবনা; এ বাণীই ছিল যাজক হওয়া ও গঠন দেওয়ার রূপরেখা ও আদর্শ; এই মন্ত্রটিই ছিল পথচলার মাপকাঠি এবং ভবিষ্যতের আলোক-দিশা। যিশুর এই কথাকে নিজের করে নিতে গিয়ে কতোবার আমরা থতমতো খেয়েছি জানা-অজানা অতৃপ্তিতে; আবার কতবার উত্তম মেষপালকের অনুকরণে 'জীবন-বিসর্জন' দেওয়ার সাধনায় উপলব্ধি করেছি তৃপ্তি ও স্বস্তির আনন্দ।

সেমিনারির গর্ভধারণ মুহূর্ত থেকে, পিতৃ-মাতৃসম ধর্মপালদের কাছ থেকে পেয়েছি বিজ্ঞ নির্দেশনা, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনে এগিয়ে এসেছে দেশী-বিদেশী কত ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসসংঘের কত সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী এবং জনগণ থেকে কত বিজ্ঞজন – যাদের পরিচালনা, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিকতা আজ স্মরণ করি বিনম্র চিত্তে, আর বলিষ্ঠ অভিবাদনে সজোরে উচ্চারণ করি তাদের অবদান ও কীর্তি-গাঁথা।

"আমি আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে" – যিশুর এই উক্তি আমাদের যাজকীয় জীবনে "জানা"র মধ্যে যতটুকু উপলব্ধি করেছি ঠিক ততখানি হয়তো উপলব্ধি হয় নি "ভালবাসা"র মধ্যে। যতটুকু যিশুর এই উক্তি সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে, ততটুকুর জন্য আনন্দমনে প্রভুর প্রশংসা করি এবং জয়ন্তী উৎসবে যিশুর এই উক্তিকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করি।

আগে যেমন বলেছি পবিত্র আত্মার সেমিনারি বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীর একটি প্রাণের প্রতিষ্ঠান। মণ্ডলীর প্রাণের মধ্যে আছে যাজক, আছে সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী আর আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় ভক্তজনগণ। পঞ্চাশ বছর পূর্বে সেমিনারি প্রতিষ্ঠার সূচনা-লগ্নে, মতামত ব্যক্ত হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত সেমিনারিটি শুধু সেমিনারিয়ানদের জন্য নয়, বরং এখানে গঠন পাবে ভাবী যাজকদের পাশাপাশী সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিস্টারগণ এবং মণ্ডলীর ভক্তজনগণ। আরও স্বপ্ন ছিল সেমিনারি হবে স্থানীয় মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও আধ্যত্মিকতা বিকাশের একটি কেন্দ্র। এখান থেকে উদ্ভাবিত হবে খ্রিস্টীয় বাংলা সাহিত্য রচনা। এই ক্ষেত্রে কোনো মনোযোগ যে দেয়া হয়নি তা নয়। একাধিক সময়ে, বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য মণ্ডলী উপকৃত ও সেমিনারির প্রতি এই জয়ন্তী উৎসবে মণ্ডলী কৃতজ্ঞ। তবে এই বিষয়ে সেমিনারির সেবাকে সম্প্রসারিত করা এবং ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতায় গভীরতা লাভ এবং খ্রিস্টীয় সাহিত্য বিকাশ-সাধনের একটি জোরদার আবেদন সর্বদাই শোনা গেছে। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, সুবর্ণ জয়ন্তীকে আরও সুদূরপ্রসারী করে তুলবে এবং উৎকর্ষের গভীরতায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে যাবে।

প্রথম শাস্ত্রপাঠে আমরা যেরেমিয়ার মুখ থেকে এই কথা শুনেছি: "আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মতো পালকদের দেব, তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে।" (যেরেমিয়া ৩:১৫)। পরমেশ্বরের এই প্রাবক্তিক উক্তি সেমিনারির বিগত ৫০ বছরে কার্যকর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেরেমিয়ার কথার মধ্যে আমরা আজ শুনতে পারছি ভাবী প্রতিশ্রুতি ও নতুনের আহ্বান।

সম্প্রতিকালে আমরা জগতে ও মণ্ডলীতে বিচিত্র ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি; সেখানে দেখছি নতুন বিষয়, নতুন ধারণা, নতুন আহ্বান; আসলে কিন্তু তা অতি পুরাতন, মঙ্গলসমাচার মূর্তায়নের জন্য আনন্দময় আহ্বান। আর এই প্রসঙ্গে: "আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মতো পালকদের দেব, তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে" (যেরেমিয়া: ৩:১৫) – যেরেমিয়ার এই বাণী আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রাবক্তিক বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।

মণ্ডলীকে নবায়ন করার ভাবনা এসেছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে – যার সূচনা হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। আজ ষাট বছরের ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারি পঞ্চাশ বছরের পথচলা অতিক্রম করেছে।

এই সুবর্ণ জয়ন্তী-লগ্নে দাঁড়িয়ে, বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কাছ থেকে এই উক্তি শুনছি: "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি ডাক দিয়েছেন "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী" গড়ার কাজে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যিশুর মঙ্গলসমাচার হবে সবার জন্য একমাত্র চলার পথ। মঙ্গলসমাচারপ্রসূত হবে সবার জীবন, মঙ্গলবাণীর আনন্দময় ঘোষণা হবে তাদের একমাত্র **মিশন**। এই মিশনের লক্ষ্যে মণ্ডলী একসঙ্গে পথ চলবে। মণ্ডলীকে হতে হবে **মিলন-সমাজ** – অন্যান্য মণ্ডলী ও ঐশজগণকে নিয়ে মিলন-সমাজ এবং যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনের মিলন-সমাজ । বর্তমান সময়ে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন তা ব্যক্তি ও সমবেতভাবে, ধ্যানে ও প্রার্থনায়, আত্মিক অবধারণের মাধ্যমে সবাই তা শ্রবণ করবে। মিলন-সমাজে সবার **অংশগ্রহণে** মণ্ডলী একসঙ্গে পথ চলবে। ধর্মপাল-যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-ভক্তজনগণ – তাদের আপন আপন মর্যাদা ও মিশন অনুসারে অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে সহযাত্রী হবে।

এই ধরনের মিশনধর্মী ও অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলীকে গঠন করতে হলে যে-ধরনের যাজক প্রয়োজন হবে, তার ইঙ্গিত পাই যেরেমিয়ার প্রবক্তার মুখে, অর্থাৎ যাজক হবেন পরমেশ্বরের "হৃদয়ের মতো পালক" – সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা, তারা "সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধিতে চারন করবে" – হৃদয়ের মতো উত্তম মেষপালকের বৈশিষ্ট্য।

পোপ ফ্রান্সিস সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে যাজকদের পরিচয় আরও বাস্তব করে বলেছেন যে, "তাদের গায়ে থাকবে মেষের গন্ধ", তারা হবেন "ক্লারিকালিজম" থেকে মুক্ত, তারা হবেন পা-ধোয়ানোর কাছে নিয়োজিত সেবাকর্মী-কর্তৃপক্ষ।

যাজক হবেন মঙ্গলসমাচার-বোধী ব্যক্তি; তিনি হবেন দীন-দুঃখী, পাপীতাপী, হারিয়ে-যাওয়া, পিছিয়ে-পড়া এবং দুর্ভাগাদের দরদী বন্ধু; তিনি হবেন ক্ষমাদানকারী সেবক, মিলন-সাধক ও শান্তি স্থাপক; তিনি হবেন প্রকৃতি- প্রেমিক, অভিবাসীদের সহযাত্রী, শিশু ও নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষাকারী সেবক। সংক্ষেপে তিনি হবেন "সিনড-বিশিষ্ট" মণ্ডলীর যাজক।

যাজকদেরকে পরমেশ্বরের "হৃদয়ের পালক" হতে হলে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, প্রথমেই প্রয়োজন "পরিবর্তন" – চিন্তাধারার কাঠামো পরিবর্তন এবং হৃদয়ের পরিবর্তন।

তাই প্রিয়জনেরা, সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে, আমরা সকল ফসল-প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের জয়কীর্তন করি, নম্রভাবে স্বীকার করি অতীতের সকল অযোগ্যতা এবং ভবিষ্যত যাজক হওয়া ও যাজকীয় গঠনকাজে সিনড-প্রক্রিয়ায় পথচলার অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করি।

পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের কথা অনুসারে পবিত্র আত্মা সেমিনারী হবে "School of the Gospel", "যিশুর মঙ্গলসমার শিক্ষালয়"। এ মহৎ কাজে ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন। আমেন ।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী সুবর্ণ জয়ন্ত্রী, ১৯শে এপ্রিল, ২০২৪।

প্রিয় মুসলমান ভাইবোনেরা,

পবিত্র মাহে রমজানের সমাপ্তিতে আজ ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারাটি মাস ধরে আপনাদের সাথে চিন্তা, ধ্যান ও প্রার্থনায় একাত্ম ছিলাম। তাই আজ আপনাদের সাথে ঈদের আনন্দ অনুভব করছি।

সেই অনুভূতিতে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য প্রচুর সুখ ও আনন্দ, শান্তি ও সম্প্রীতির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

পোপ ফ্রান্সিসে সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও বলছি: "কোন যুদ্ধই পবিত্র নয়, একমাত্র শান্তিই হল পবিত্র।"

"খ্রিস্টান এবং মুসলমান আশার সাক্ষী"। একটি জলন্ত মোমবাতির আগুন আলো ও আশার প্রতীক - অন্ধকারকে দূর করে দেয়। কিন্তু সহিংসতা ও যুদ্ধের আগুন সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। তাই আসুন, আমরা সহিংসতা ও যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে একটি শান্তির মোমবাতি জ্বালাই।

পরিশেষে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন আপনাদের জীবনে শান্তি, আশা ও আনন্দের প্রচুর ফসল বয়ে আনুক – এই কামনা করি। ঈদ-মোবারক !

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
১১ই এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

Message

Cardinal Patrick D' Rozario CSC
Archbishop Emeritus of Dhaka

On this occasion of 50th Anniversary of the Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), I am filled with immense pride and gratitude for the remarkable journey of service and compassion that CCDB has undertaken during the span of half a century.

Since its inception, CCDB has been a glimmer of light for the poor and marginalized communities across Bangladesh. Through its enormous efforts and unwavering commitment, CCDB has not only provided essential support and resources but has also empowered individuals and communities to build a better future for themselves.

As Archbishop Emeritus of Dhaka and a witness to the transformative work of CCDB, I am deeply moved by the dedication and passion exhibited by all those involved in this noble endeavor. From the leaders and staff

members to the invaluable support of our partners and well-wishers, it is through your collective efforts that CCDB has been able to touch the lives of countless individuals and families in need.

As we reflect on the remarkable journey of CCDB, let us reaffirm our commitment to serving those in need, guided by the teachings of Jesus Christ. Together, let us continue to build a world where justice flows like a river and where all God's children are embraced with love and respect.

In closing, I offer my prayers and blessings for the continued success and prosperity of CCDB and pray that it may continue to be a shining light for the people of Bangladesh for many years to come.

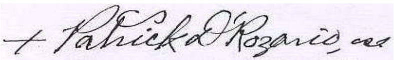

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

সেন্ট টমাস কাথিড্রালের দুই শতাব্দী বর্ষপূতি

লক্ষীবাজার, জনসন রোড, ঢাকা

ভূমিকাঃ

নিমন্ত্রণের জন্য পরম শ্রদ্ধেয় সামুয়েল সুনিল মানকিন, মডারেটর এবং বিশপ অব ঢাকা ডাইয়োসিস, চার্চ অব বাংলাদেশ-কে অনেক ধন্যবাদ, সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজকের উদ্‌যাপনে প্রতি-শুভেচ্ছা, মঙ্গল-অনুগ্রহ, এবং শান্তি-আনন্দের আশিস জ্ঞাপন করছি। চার্চ অব বাংলাদেশের সাথে কাথলিক মণ্ডলীর সম্পর্ক উদ্‌যাপন করছিঃ

১) খ্রিস্ট-যিশুর সাথে একাত্মতা ও বাণী প্রচারঃ সাধু পলের কথা দিয়ে বলিঃ "খ্রিস্ট-যিশুর সাথে মিলিত হয়ে তোমরা যে ঐশ-অনুগ্রহে ধন্য হয়েছো, তার জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।... খ্রিস্টের সম্বন্ধে প্রচারিত সাক্ষ্য-বাণী তোমাদের কাছে তো দৃঢ় স্বীকৃতিই পেয়েছে" (১করি ১:৪,৬)। - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

২) কাথলিক মণ্ডলী ও অ্যাংলিকান মণ্ডলী একই গোড়ায় এবং কাছাকাছি অবস্থানঃ বিশ্বজনীন মণ্ডলীর গোড়ায়, লক্ষীবাজারে দুই মণ্ডলীর পাশাপাশি অবস্থান। অনেক বিষয়ে ও ক্ষেত্রে ধর্মনীতি, ধর্মসংস্কার, আধ্যাত্মিকতায় ও ধর্মানুশীলনে ও ঐক্য প্রচেস্টায় কাছাকাছি অবস্থান। তবে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য ও অমিল আছে। - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৩) বিশপ যিনি মণ্ডলীর পালকঃ অ্যাংলিকান সম্প্রদায়ের বিধিসম্মতভাবে অভিষিক্ত পালক ও পুরোহিতবর্গ। সবার বিশপ বিডি. মন্ডল; মণ্ডলী পরিচালনে দায়িত্ব; ভক্তজনগণের ভূমিকা বিষয়ে সাদৃশ্য - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৪) পারস্পরিক ঐক্যের সাক্ষ্যদানঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা (কাশিপুর গির্জা, হোস্টেল, কল্লোল গৃহ) আধ্যাত্মিক সেবা (আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা), শিক্ষা ও উপদেশ বাণী প্রচারে (নির্জন ধ্যান-সভা পরিচালনা), অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদিতে সহযোগিতা-সহভাগিতা, সহ-দায়িত্ব, সহযোগিতা। - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৫) সকল মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টা সিওবি-এর সর্বাদাই ছিল; সেই প্রচেষ্টার - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৬) প্রত্যাশা ও সাফল্য কামনা।

HOLY SPIRIT MAJOR SEMINARY
GLORIOUS 50 YEARS TOWARDS BUILDING THE LOCAL CHURCH

MESSAGE

How fortunate I am, to be still alive and get the favour of celebrating the Golden Jubilee of the Holy Spirit Major Seminary, the constant stream that flows to the Local Church in Bangladesh!

With joy and gratitude I write this few lines because God had blessed me by making me a part of the dreaming that was done together with others regarding this core institution of the Local Church.

Thanks to the ecclesial authority that I was sent abroad for studies in order to journey with the seminary in teaching, animating and directing from the time when it was three year old.

The focal motivation that drove me always was to build the Church in Bangladesh according to the vision, mission and direction given by the Second Vatican Council.

The raison-d'etre of the Seminary, which was and still being shared by others is: (a) seminary for formation of future priest, (b) seminary for promotion of theological thinking for one-self and for others and (c) seminary for service to the laity, religious men and women and ongoing *agiornamento* of the clergy of the Local Church, shall remain as challenges beyond years of anniversaries.

With deepest honour and respect we bow our heads to the Bishops who initiated, to those who went before and to those who still continue to walk the path. Congratulations to those who taught, were taught and still are being taught.

On the occasion of the Golden Jubilee of the Holy Spirit Major Seminary, we harvest with joy the fruits of the seed planted by others in tears. Let God bless us all and the Local Church.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

পুনরুত্থিত প্রভু যিশু – আমাদের প্রত্যাশা

প্রিয়জনেরা,

প্রথমেই পুনরুত্থান পর্বের আনন্দময় শুভেচ্ছা এবং প্রত্যাশাপূর্ণ জীবন সকলার জন্যে কামনা করি।

আগামী বছর ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ হচ্ছে খ্রিস্টমণ্ডলীর মহান জুবিলীবর্ষ – দুই সহস্রাব্দ ও পঁচিশ বছরের পূর্তি জয়ন্তী। পোপ মহোদয় জুবিলীবর্ষের মূলভাব হিসেবে "প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী আমরা" বেছে নিয়েছেন। মহান জুবিলীর প্রস্তুতি স্বরূপ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দটিকে প্রর্থনাবর্ষ হিসেবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আসছে পুনরুত্থান পর্বে আমাদের সকল ধ্যানের জন্য "পুনরুত্থিত প্রভু যিশু – আমাদের প্রত্যাশা" বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারি পারি।

যিশুর যাতনা ও মৃত্যুর সময়ে আমরা যিশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেক নিরাশা ও হতাশা লক্ষ্য করি। সাধু পল সংক্ষিপ্ত আকারে বলেন যে, যিশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, সমাহিত হলেন, এবং তৃতীয় দিনে উত্থান করে তিনি প্রেরিতশিষ্যদের নিকট দেখা দিলেন। পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর সঙ্গে সাক্ষাত থেকেই সুরু হয়েছে খ্রিস্টের প্রতি শিষ্যদের বিশ্বাস। পুনরুত্থানের প্রতি ধর্মবিশ্বাস থেকেই খ্রিস্টধর্মের সূচনা। যাতনাভোগ করা, মৃত্যুবরণ করা, সমাধিস্ত হওয়া বিশ্বসের বিষয় নয়। বরং যিশু পুনরুত্থান করেছেন, তিনি আর মৃত নন, তিনি জীবিত – এটাই বরং বিশ্বাসের বিষয়। এখান থেকেই বিশ্বাসের উদ্ভাবন ও জাগরণ। সকল নিরাশা, সকল হতাশা, সকল ব্যর্থতার মধ্যে পুনুরুত্থানই হচ্ছে একমাত্র আশার আলো।

তাই পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা স্বরূপ সবার নিকট আবেদন করিঃ সমস্ত হতাশা-নিরাশা ছেড়ে দাও, হতাশা-নিরাশার অন্ধকার থেকে আলোতে বের হয়ে এসো, মৃত্যুর কবর থেকে বেরিয়ে এসো; কারণ আমাদের প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, নতুন জীবন নিয়ে এসেছেন, তিনি আমাদের মাঝে জীবিত। এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা আমাদের জীবনের তীর্থযাত্রায় আগামী দিনের পথ চলি।

Dear Brothers and Sisters,

As we celebrate Easter, we celebrate our faith in the Risen Lord. The passion, death or burial is not the act of faith, it is a historical fact. Christian faith begins when we believe that Jesus is Risen, that He is alive in us and in the World.

Hence I wish that let the faith in the Risen Christ, takes away all the desperate, hopeless and discouraged situation of our life. Let the Risen Lord of Easter brings in us faith and which in turn brings hope in our journey of Pilgrimage.

"O death, where is thy victory"? "O death, where is thy sting"? We carry this cry in our heart in these days of Easter. We will be able to answer that Jesus is there, he continues to be alive among us: Alive and Risen.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka
Easter – 2024.

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা অনুসারে ন্যায় ও শান্তি

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

পবিত্র ক্রুশ সাধনা-গৃহ-এর স্কলাষ্টিকদের দ্বারা প্রকাশিত "প্রতীতি" প্রকাশনার জন্য এবারের মূলভাব নেয়া হয়েছে "ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজকদের ভাবনা ও কার্যক্রম"। উক্ত মূলভাবের প্রেক্ষিতে একটি লেখা আহ্বান ক'রে আমার কাছে "পোপ ফ্রান্সিসের ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক ধর্মোপদেশ ও চিন্তাধারা" বিষয়টি দেয়া হয়েছে । "প্রতীতি"র মূল বিষয়টা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য লেখার বিষয়গুলো দেখে আমি ভাবলাম আমার লেখার প্রথম অংশে সকল লেখার প্রেক্ষাপট হিসেবে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ে কিছু মৌলিক ধারণা তুলে ধরি এবং দ্বিতীয় অংশে উক্ত বিষয় সম্পৃক্ত মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার কয়েকটি বিষয় মোটা দাগে উল্লেখ ক'রে তৃতীয় অংশে বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কিছু চিন্তাধারা উপস্থাপন করি।

॥ ১ ॥ ন্যায় ও শান্তি বিষয়ে মৌলিক ধারণা

একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন: "মানুষের পথ ধরে চলো, তা হলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবে; ঈশ্বরের পথ ধরে চলো, তাহলে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে"। এ কথার অর্থ হচ্ছে ন্যায্যতা শুধু মানবিকতার বিষয়, অর্থাৎ মানুষের পথ ধরে চলার বিষয় শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের পথে চলারও বিষয়। আবার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবন ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা শুধু ঈশ্বরের পথে চলার বিষয় নয়, বরং ন্যায্যতা বা মানবিকতার পথে চলার বিষয়ও বটে।

ন্যায় বা ন্যায্যতা হচ্ছে চারটি মানবিক বা নৈতিক গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। অন্য তিনটির নাম হচ্ছে: সদ্বিবেচনা বা বিচক্ষণতা, সৎ-সাহস এবং মিতাচার বা সংযম। তিনটি নৈতিক গুণের সাথে ন্যায্যতা সব সময় সাথী হয়ে পথ চলে।

ন্যায্যতার চারটি মূল নীতি রয়েছে: সমতা, নিরপেক্ষতা, ন্যায্য অধিকার, ন্যায়-পদ্ধতি, ক্ষতিপূরণ/পুনর্মিলনমূলক ন্যায্যতা।

(ক) ন্যায্যতা বিষয়ে সাধারণ ধারণা

(১) ন্যায় বা ন্যায্যতার অর্থ

ন্যায্যতা বলতে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় বলা হয়েছে যে, *ন্যায্যতা* হচ্ছে একটি "মানবিক সদ্‌গুণ" বা "একটি নৈতিক গুণ – ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার অবিচল ও অবিরাম ইচ্ছা। ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় 'ধর্মের গুণ'। মানুষের প্রতি ন্যায্যাতা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানব সম্পর্কের মধ্যে মিলন স্থাপনের ইচ্ছা জাগ্রত করা, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি ও গণমঙ্গল সম্পর্কিত সমতা।" (কা.ম.ধ. ১৮০৭)

ন্যায্যতা হল প্রত্যেককে তার পাওনা দিয়ে দেওয়া। মানুষ হিসাবে যা প্রাপ্য সেটাই তার পাওনা। মানুষের পাওনাগুলোই হচ্ছে তার অধিকার, যাকে বলা হয় মানবাধিকার।

(২) ন্যায্যতার প্রকারভেদ:

- *আইনসম্মত ন্যায্যতা:* নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য যা বিধিসম্মত করা হয়েছে।
- *বিনিময়াত্মক ন্যায্যতা:* যে-ন্যায্যতা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সকল বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বিধিসম্মত করা হয়ে থাকে।

- *বন্টনাত্মক ন্যায্যতা:* নাগরিকের প্রয়োজন ও অবদানের অনুপাত অনুসারে রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের প্রাপ্য।
- *সামাজিক ন্যায্যতা:* উপরোক্ত ক্লাসিকাল প্রকারভেদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে "সামাজিক ন্যায্যতা" নামে আরেক প্রকার ন্যায্যতা যুক্ত হয়েছে আর এই ন্যায্যতা সাম্প্রতিক কালে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করছে। *সামাজিক বিষয়সমূহের* পরিধি অনেক ব্যাপক এবং সামাজিক ন্যায্যতার বিষয়গুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেখান থেকে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের সঙ্গেও জড়িত।

(৩) অন্যায়কে দু'ভাবে চিহ্নিত করা যায়:

ব্যক্তিগত অন্যায়: একজন ব্যক্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া (উদাহরণ: চুরি করা, হত্যা করা, দুর্নাম করা, ইত্যাদি)

সামাজিক অন্যায়: এই বিষয়টা জটিল কারণ সামাজিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা এর সাথে জড়িত আছে, যেমন: আইনকানুন, সামাজিক ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-পদ্ধতি, ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সামাজিক অন্যায় ব্যবস্থাকে "সামাজিক পাপ" বলা হয়। উদাহরণ: যৌতুক প্রথা, শিশুশ্রম, নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, কালো আইন, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, নির্যাতন, দুর্নীতি, শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচরণ।

অন্যায় আচরণের ভিত্তি হচ্ছে মানব-অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা; একই মানব-পরিবারের সদস্য-সদস্যা হিসাবে প্রত্যেকের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার আছে, সেই অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত থাকতে পারে না।

(৪) মানবাধিকারসমূহ:

যেহেতু অন্যায্যতা হচ্ছে মানবাধিকার থেকে বঞ্চনা বা মানবাধিকার লঙ্ঘন, সেহেতু মানবাধিকারসমূহ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক ও বাঞ্চণীয়। মানবাধিকারসমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করা হল:

(ক) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ: বেঁচে থাকা, আইনের আশ্রয় নেওয়া, ভোটদান, অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি, ন্যায়বিচার পাওয়া, বুদ্ধি-পরামর্শ নেওয়া, সংঘ-সমিতি করা, নাগরিক দায়িত্বে অংশগ্রহণ করা, সমাবেশ করা, মতামত প্রকাশ করা, বিবেকের স্বাধীনতা, বসতি পরিবর্তন করা, ইত্যাদির অধিকার।

(খ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ: সম্পত্তি অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, কর্মসংস্থান, ন্যায্য পারিশ্রমিক, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তি (লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পদ ও ক্ষমতা), শিক্ষালাভ, সুনাম রক্ষা, পরিবেশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও তথ্য জানা, ইত্যাদির অধিকার।

(গ) বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির অধিকার: পরিবার, শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী, ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, জাতিগোষ্ঠী, কর্মজীবি, প্রতিবন্ধী, আসামী, কয়েদী, অভিবাসী, দেশ ও জাতি, ইত্যাদির অধিকার।

(খ) শান্তি বিষয়ে সাধারণ ধারণা

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় শান্তি সম্পর্কে এই কথা বলে: "মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন **শান্তি**। তবে শান্তির মানে শুধু যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয় এবং শুধু শত্রুপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করাই নয়। ব্যক্তি মানুষের সম্পদ রক্ষা করা, মানুষের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ স্থাপন, ব্যক্তি ও জাতিগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিরন্তর ভ্রাতৃপ্রেমের অনুশীলন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। শান্তির অর্থ হচ্ছে "সুষম ব্যবস্থা"। শান্তি হচ্ছে ন্যায্যতার কাজ এবং প্রেমের ফসল" (কা.ম.ধ. ২৩০৪)।

ন্যায্যতা ও শান্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক:

শান্তি হচ্ছে "পবিত্র আত্মার ফলস্বরূপ", যাকে আবার "ভালবাসার ফলস্বরূপ" বলেও আখ্যায়িত হয়। পবিত্র আত্মা ন্যায্যতা ও ভালবাসার চালিকাশক্তি; এবং আত্মা সকল খ্রিস্টীয় ন্যায্যতার সংগ্রামকে সঞ্জীবিত করে। আবার বলা

হয়: ভালবাসার প্রথম ধাপ হচ্ছে ন্যায্যতা; ভালবাসা ন্যায্যতার প্রাণ। পোপ ত্রয়োবিংশ বলেছিলেন "উন্নয়নের অপর নাম শান্তি"। শান্তি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ফল। ন্যায্যতা ব্যতিত শান্তি সম্ভব নয়; ভালবাসা/ক্ষমা ব্যতিত ন্যায্যতাও সম্ভব নয়। "শান্তির জন্য ন্যায্যতা যেমন, ন্যায্যতার জন্য ক্ষমাও তেমনি অপরিহার্য।"

সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাভাবনায় এই ভাবটি সত্য হয়ে আসছে যে, ন্যায় যদি শান্তির ফল হয় তাহলে বর্তমানে এ কথা বলা যেতে পারে যে, শান্তি একাত্মতার বা সংহতির ফল স্বরূপ। শান্তির লক্ষ্য অর্জিত হবে যদি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের ঐক্য ও বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়, মানব পরিবারে মানুষ যদি পরস্পরের সঙ্গে ভাইবোন হিসেবে জীবন যাপন করে।

শান্তির বিপরীত হচ্ছে: প্রথমত মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চনা; সম্পদ, ক্ষমতা ও ভোগের লিপ্সার কারণে অধিকার থেকে বঞ্চণা; দ্বিতীয়ত কোন্দল, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, সংঘাত, সহিংসা ইত্যাদি। শান্তির প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুসম্পর্কের মধ্যে।

অন্যায়ের প্রতিকার: অন্যায়ের সামনে তিন ধরনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হতে পারে:

- নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া: সাধারণত এটাই লক্ষণীয়;
- সহিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া: অন্যায়কারীরা যে কৌশল ব্যবহার করে ঠিক একই প্রকার কৌশল প্রয়োগ, যেমন: প্রতিশোধ, নিপীড়ণ, শোষণ, সহিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও কার্যকলাপ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ, ইত্যাদি।
- সক্রিয় অহিংসামূলক প্রতিক্রিয়া: সমস্যা সমাধানে জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য, ভালবাসা, ন্যায়ের শক্তি, সংলাপ, অহিংসাবাদ ও পদ্ধতি ও অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করে।

॥ ২ ॥ মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ন্যায় ও শান্তি বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা ও শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, তাঁর পূর্বসূরী পোপ মহোদয়দের পরিচালনায় মণ্ডলীতে যে সামাজিক শিক্ষা গড়ে উঠেছে তা থেকে কোন ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। শুধু তাই নয়, বিগতকালের মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সাথে পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিবেচনা ক'রে এবং তাঁর নিজস্ব শিক্ষার নতুনত্ব ও অগ্রাধিকার সুস্পষ্ট ভাবে বোধগম্য করতে হবে।

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার উৎস হচ্ছে পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে প্রেরিতদের রচনাবলী পর্যন্ত। আদি থেকে সেটাই ছিল মণ্ডলীর শিক্ষা; এই শিক্ষা আধুনিককালের নানাবিধ "সামাজিক প্রশ্ন"-এর পেক্ষাপটে পোপ ত্রয়োদশ লিও'র *"রেরুম নভারুম" বা "নতুন বিষয়"* নামক বিশ্বজনীনপত্র দিয়ে সামাজিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা মূলত হচ্ছে মণ্ডলী কীভাবে সমাজকে এবং সমাজের অবকাঠামো ও পরিবর্তন কীভাবে দেখে তারই প্রকাশ। মণ্ডলীর সকলে – যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং ভক্তজনগণ – এই সামাজিক শিক্ষা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(ক) মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার কয়েকটি নীতি

প্রথমে, যুগ যুগ ধরে মণ্ডলী কোন্ কোন্ বিষয়ে এবং কী কী শিক্ষা দিয়ে আসছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় কয়েকটি শিরোনামে তুলে ধরছি:

(১) মানবজীবন এবং মানবব্যক্তির মর্যাদা: এটাই মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার মূল ভিত্তি। আমরা সকল মানুষ ঈশ্বর থেকে আগত, ঈশ্বরের জন্য আমরা এবং ঈশ্বরের প্রকাশ আমরা। তাই আমাদের রয়েছে অলঙ্ঘনীয় মর্যাদা। এই মর্যাদার পরিপন্থী যা কিছু তা-ই অন্যায়। অন্যায় চিহ্নিত করতে এবং কী ভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার মাপকাঠি এই নীতি।

(২) গণমঙ্গল: গণমঙ্গল হচ্ছে সমাজের সেই সকল অবস্থা বা ব্যবস্থাপনা যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকে আরও উন্নত ও সহজ ভাবে পূর্ণতা অর্জন করতে সাহায্য করে: সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ, সাংস্কৃতিক আচরণ, প্রশাসনিক অবকাঠামো, ইত্যাদি।

(৩) **সম্পদের সর্বজনীন লক্ষ্য:** যাকিছু উত্তম ও জীবন রক্ষা করে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং তা সকল মানবজাতির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। এটাই হচ্ছে সমগ্র নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রথম নীতি। প্রকৃতিগত ভাবে প্রকৃতির প্রতি সবার অধিকার আছে দৈহিক জীবন-রক্ষা ও ভবিষ্যত জীবন-সম্ভাবনাকে বাস্তবমূর্ত করার জন্য। এই নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে সামাজিক শিক্ষার অন্যতম নীতি: ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন ও তত্ত্বাবধায়ন, যার আলোচনা পোপ ফ্রান্সিসের প্রসঙ্গে করা হবে।

(৪) **অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার নীতি:** উর্ধতন পর্যায়ের কোন কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত কাজ করবে না, যে-কাজ অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথ ও ফলপ্রসূ ভাবেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। এর ব্যত্যয় ঘটালে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। এই নীতিকে "সহযোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা-নীতি" বলেও অভিহিত।

(৫) **একাত্মতা অথবা সংহতি:** মানুষ সামাজিক জীব; একা একা জীবন যাপন করতে পারে না; স্বভাবগত ভাবেই পরনির্ভরশীল; কেউ একা থাকে না, একা পাপ করে না, একা মুক্তি পায় না; আমার জীবনে অন্যেরা ঢুকে পড়ে এবং আমিও অন্যের জীবনে ঢুকে পড়ি। এই একাত্মতা শুধু প্রকৃতিগত নয়; বরং যা প্রকৃতিগত তা মানবিক সিদ্ধান্তের ফলে নানা সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে তুলি বা তুলতে হবে।

(৬) **দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন:** এই নীতি যিশুর শিক্ষাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সমাজে যারা দরিদ্র ও ঝুকিগ্রস্ত তাদের প্রয়োজন মেটানোই গণমঙ্গলের প্রথক কাজ। যুক্ত রাষ্ট্রের বিশপগণ বলেছেন: "ধনীদের বাসনার পূর্বে দরিদ্রদের প্রয়োজন অগ্রাধিকার পাবে; মুনাফা লাভের আগে শ্রমিকদের অগ্রাধিকার; নিয়ন্ত্রণহীন শিল্পের প্রসারণের পূর্বে পরিবেশ সংরক্ষণের অধিকার।"

(খ) সামাজিক ন্যায্যতার প্রধান নীতিসমূহ

সামাজিক ন্যায্যতা হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা যার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক সম্বন্ধে, এবং সম্পদ, সুযোগ ও সামাজিক বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা-ধারণা।

সামাজিক ন্যায্যতার প্রধান পাঁচটি নীতি হল:

(১) **সামাজিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার:** প্রত্যেকে যেন সেই সমস্ত সামাজিক সুবিধা পেতে পারে যা মানবিক জীবনযাপন করার জন্য প্রয়োজন, যেমন, খাদ্য-পানীয়, বস্ত্র, আশ্রয়-গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং চিত্তবিনোদনের সুযোগ। বাস্তবে এই সব ব্যাপারে সমাজে অসম অধিকার ররেছে।

(২) **সামাজিক বৈষম্যহীনতা:** আপন প্রয়োজন অনুসারে সেই সমস্ত সুযোগ লাভ করা যাতে সবাই তার আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে; এর অর্থ হচ্ছে বৈষম্যশূন্য এবং ন্যায়-ব্যবস্থা যেখানে পক্ষপাতদুষ্টতা নেই। বৈষম্যহীনতা ও সমতা এক নয়। সমতা হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য একই সুযোগ দেওয়া যাতে সবাই একই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

(৩) **সামাজিক অংশগ্রহণ:** সামাজিক অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের কথা নিজে বলতে পারে, নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং নিজেদের জীবিকা ও জীবনের চাহিদা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে।

(৪) **সামাজিক বিভিন্নতা:** সমাজের বিভিন্নতা ও কৃষ্টিগত পার্থক্য স্বীকার করা একান্তপ্রয়োজন বিশেষ করে, যারা নীতি প্রণয়ন করে তাদের জন্য, কারণ তারা বিভিন্ন সমাজগোষ্ঠির বিভিন্নতা বিবেচনায় রেখে নীতি প্রণয়ন করে। এ কারণে সমাজের প্রান্তিক, সুবিধা-বঞ্চিত ও পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠিকে অগ্রাধিকার দেওয়া সামাজিক ন্যায্যতার দাবি। উদাহরণ স্বরূপ, যে সমাজে জাতি, লিঙ্গ, জাতি, নৃগোষ্ঠি, পুরুষ-নারী, বয়স ও অন্যান্য বিশেষ বিষয়ে সমাজে চলমান আলোচ্যবিষয় হয়ে থাকে সেখানে বিভিন্নতা বিবেচনা করা আবশ্যক।

(৫) **সামাজিক মানবাধিকার:** সামাজিক ন্যায্যতাও সকল নীতি ও ধারণার মৌলিক বিষয়। মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায্যতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের অস্তিত্বের কারণ। মানবাধিকার সেই সমস্ত সমাজের ভিত্তিমূল, যে-সমাজ ব্যক্তি, সরকার ও সংগঠনের নাগরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত, আইনগত ব্যক্তি অধিকারকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি এই অধিকার সংরক্ষণ করে না তারা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

॥ ৩ ॥ সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্বজনীনপত্র এবং প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র প্রকাশ করেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সামাজিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এবং বর্তমান প্রবন্ধের সাথে প্রযোজ্য তিনটি দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হল। পোপের এই দলিল তিনটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই দলিলগুলোতে পোপ ফ্রান্সিসের উল্লেখিত ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক ধারণা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল।

(ক) Pope Francis, *Evangelii Gaudium – "The Joy of the Gospel" 2013,*

অনুবাদ: ***মঙ্গলবার্তার আনন্দ*****,** অনুবাদ-সম্পাদক: সিস্টার শিখা লিটিশিয়া গমেজ, সিএসসি, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.

মণ্ডলীর মিশন হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। মঙ্গলবাণী ঘোষণা সমস্ত খ্রিস্টবিশ্বাসীর দায়িত্ব; আধুনিককালে মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ ও বাধা রয়েছে; এবং কীভাবে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা যেতে পারে তার নির্দেশ পোপ মহোদয় দিয়েছেন। মণ্ডলীর ভেতরে প্রত্যেককে মিশনারী হয়ে মঙ্গলবাণী ঘোষণা ক'রে মণ্ডলীকে রূপান্তর ও নবায়ন করতে হবে।

মণ্ডলীর বাইরে আধুনিক সমাজে, সামাজিক বিষয় ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে, দরিদ্রদের পক্ষ নিয়ে, গণকল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে হবে।

মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে হলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া এবং যিশুর সাথে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাত এবং যিশুর দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ ক'রে, পাপ, দুঃখ, আভ্যন্তরীণ শূণ্যতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা মঙ্গলবাণীর আনন্দ উপলব্ধি করবে।

(ক) Pope Francis, *Laudato Si' – "Praised Be to You"* – Encyclical Letter on the Care for Our Common Home, 2015. ***তোমার প্রশংসা হোক – আমাদের অভিন্ন বসবাটির যত্ন*****,** *কারিতাস বাংলাদেশ*, ২০১৬ খ্রি.

(১) লাইদাতো সি – বিশ্বজনীনপত্রের সারসংক্ষেপ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ১৮ই জুন ২০১৫ খ্রি. ***"হোক তোমার প্রশংসা" (লাউদাতো সি)*** শীর্ষক একটি সর্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছেন। এই পত্রের মূল বিষয় হচ্ছে **প্রকৃতি ও পরিবেশ**; পত্রটি ধরিত্রী নামক "সর্বসাধারণের আবাস-গৃহ"-এর যত্ন নেওয়ার পথদিশা। বিশ্ববাসী এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এই পত্রটি লিখেছেন। পরিবেশের উপর এই পত্রটি মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার অংশবিশেষ এবং খুবই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধরিত্রীর প্রতি সকল অন্যায়ের ঘোর সমালোচনা, প্রতিবাদ এবং সমাধান প্রস্তাব করেছেন।

যে পৃথিবীতে আমাদের নিবাস, যে এলাকায় আমাদের অবস্থান, যে বসতবাড়ীতে আমরা বাস করি সেখানকার প্রকৃতি কত অপব্যবহার ও কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। আমাদের আশেপাশের *প্রকৃতি আজ চিৎকার করে বিলাপ করছে*; সৃষ্টি "প্রসববেদনায় গুমরে মরছে" (রোমীয় ৮:২২)। প্রকৃতির মধ্যে দেখি বায়ু দূষণ; বন-বৃক্ষ নিধনে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড; ত্রুটিপূর্ণ ও মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন এবং নির্গত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। পানি দূষণের ফলে পানীয় জলের অভাব; পানির যতটাই দুর্গন্ধ ততটাই বিবর্ণ; অন্যদিকে গৃহস্থালী বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা, প্রয়োজনমত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাপনার অভাবসহ নানাবিধ কারণে প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। খাল-বিল-ডোবা-নালা ও জলাশয় দিন দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে; ফলে পানি-ধারণের ক্ষমতা ধরণী হারিয়ে ফেলছে; প্রকৃতিতে জীব-বৈচিত্র হ্রাস পাচ্ছে; ঘরে-ঘরে, কলকারখানা-প্রতিষ্ঠানে, হাটে-মাঠে-বাজারে, গ্রামে-শহরে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে শব্দ দূষণ; অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসিক এলাকায় শিল্পের প্রবেশ,

সুন্দর বসতবাড়ী বস্তিতে পরিণতি; ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন, ইত্যাদির মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে পরিবেশের বিপর্যয়। তাই প্রকৃতি কাঁদছে, সজোরে আর্তনাদ করছে।

এ অবস্থা প্রকৃতির প্রতি মানুষের বড়ো অন্যায়। জলবায়ু-ন্যায্যতা বিশ্বে নিশ্চিত করতে হবে। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, স্থানীয় সমাজ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে আহ্বান জানান যেন আমরা সবাই *সৃষ্টির আর্তনাদ শ্রবণ করি*, প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষা ও যত্নের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করি। তিনি বলেন সবাই মিলে, সবার বসত-বাড়ি এই পৃথিবীটাকে রক্ষা করতে মানবজাতি এখনও সক্ষম।

সৃষ্টি ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী। এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা; আবার তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন ঈশ্বর, প্রতিবেশী ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়া। (দ্রঃ আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায়)

পোপ মহোদয় বলেন যে, আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের আছে *ত্রিমুখী খ্রিস্টীয় দায়িত্ব* ঃ সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাস-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রেম ও প্রতিবেশীপ্রেমের সাথে প্রকৃতিপ্রেম দশ আজ্ঞারই অবিচ্ছেদ্য দাবি। প্রকৃতির উপর যে কোন ধরনের আক্রমণ মানব-মর্যাদার পরিপন্থী। আবার অন্যদিকে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের হৃদয়ে যদি না থাকে মমতা, কোমলতা ও ভাবনা, তাহলে প্রকৃতিকেও আমরা প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে পারি না।

পরমেশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি বললেন: "তোমরা বশীভূত কর।" এ কথা দিয়ে ঈশ্বর মানবজাতিকে আহ্বান করলেন যেন মানুষও ঈশ্বরের মতো সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করে। ঈশ্বর আমাদের হাতে সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা *বিশ্বস্ত কর্মচারী* হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করি।

পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকভাবে মানুষের উন্নয়ন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা যদি *সকল ব্যক্তি ও প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের* জন্য পৃথিবীর সম্পদ বিনিয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই ব্যবসা অযৌক্তিক, অন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী।

বর্তমান পরিবেশের দূরাবস্থা ও বিপর্যয়ের *মূল কারণে রয়েছে মানুষ*। পরিবেশের কথা না ভেবে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভেবেছে। যার ফলে এসেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়। মানুষকে এর বিরুদ্ধে বিবেকী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিকার করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ মহোদয় *"সমন্বিত পরিবেশ"*, অর্থাৎ পরিবেশকে সামগ্রিক বা অখণ্ডভাবে দেখার নীতির বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানবতা, পরিবার ও নগরায়ন, প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র বাসের স্থান বলে বিবেচনা করা যাবে না। "সমন্বিত পরিবেশ" ভাবনা হতে হবে ন্যায়বিচারের নতুন নীতি।

মানব পরিবেশ *"গণমঙ্গল"* নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে যারা দরিদ্র অবস্থায় পড়েছে তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসায় অগ্রাধিকার দেওয়া ন্যায্যতার দাবি।

"সমন্বিত পরিবেশ" নীতি নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ মানুষের আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল ও সংস্থার সৃজনশীলতা ও উদারতা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। তারা প্রকৃতির বিরূপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, উৎপাদনশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে, অনেক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে *সফল-প্রচেষ্টা* চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বজনীনপত্রটি অধ্যয়ন করতে হবে। এই পত্রের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের সঠিক অবস্থা জানতে ও তার লক্ষণগুলো বুঝতে এবং তার মূল কারণগুলো আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন সফলতার উদ্যোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং *সচেতনতা ও শিক্ষা* গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের অবস্থা জানা ও বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রয়োজন *আলাপ-আলোচনা, ঐকমত্য পোষণ ও বাস্তব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা* যেখানে আমরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রত্যেকে জড়িত হব। এ ব্যাপারে আমাদের সদিচ্ছা ও নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে পোপ মহোদয় নির্দেশ দেন।

পোপ মহোদয় নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন যে, পরিবেশ রূপান্তরের জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন *অন্তরের পরিবর্তন*। তাই অন্তরের পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে আর তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষালয় জড়িত থাকবে, যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, ধর্মশিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবর্তনের সূচনা হবে *"নতুন জীবযাপন পদ্ধতি"* গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবন-অভ্যাসে আসবে পরিবর্তন, যেমন: জল ব্যবহারে পরিমিতি, বায়ু ও শব্দ দূষণের বিপরীতে কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ; বৃক্ষরোপন ও যত্ন, যত্রতত্র বর্জ্য না-ফেলানো, জৈবসারের ব্যবহার, অপচয় ও 'ফেলে-দেওয়ার' আচরণ বর্জন; বাড়ী ও জমির সীমানা-নির্ধারণ, গৃহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পরিবেশবান্ধব মনোভাব এবং প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম; প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ, ভোগ ও গচ্ছিত করার অভ্যাস বর্জন; জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুনঃব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস; বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও অপচয়রোধ।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, আমাদের থাকবে একটা *ধ্যানী মনোভাব*: প্রকৃতির সবকিছুকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার মনোভাব; আমার নয়, সবই পেয়েছি পরমেশ্বরের কাছ থেকে -- এরূপ ভাব। তাছাড়া ঈশ্বর তো আমাদের দিয়েছেন পরিবেশ বিশ্লেষণ করা ও পরিবর্তন করার সক্ষমতা। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের দেবেন সৃজনশীলতা এবং নব উদ্যম।

স্বাধীন ও সচেতনভাবে যখন আমরা সংযমী জীবন যাপন করি তখন অন্তরে উপলব্ধি হয় গভীর আনন্দ -- *মঙ্গলবাণীর আনন্দ*। নতুন করে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা একে অন্যের জন্য প্রয়োজন, অন্যের প্রতি আছে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভালো হওয়া, ভাল করা ও ভালো থাকার একটা মূল্য আছে।

পোপ মহোদয় প্রতিদিনের খ্রিস্টীয় জীবন-সাধনায় নিয়মিত *মন-পরীক্ষার* সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যেন প্রতিদিন গভীরভাবে চিন্তা করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে, নিজের ও অন্যের সাথে এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলনসাধনায় জীবনযাপন করি। আসিসির *সাধু ফ্রান্সিস* আমাদের যাত্রাসঙ্গী হয়ে থাকুন, কেননা তিনি প্রকৃতিপ্রেম ও দরিদ্রদের প্রতি ন্যায্যতা, সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তরীণ শান্তির আদর্শ। *কুমারী মারীয়া*, যিনি তাঁর সন্তানের যত্ন নিয়েছেন সেই একই মাতৃত্ব ও বেদনা নিয়ে তিনি আমাদের যত্ন নিন। *সাধু যোসেফ*, মণ্ডলীর যিনি প্রতিপালক, তিনি আমাদের শিক্ষা দিন যাতে আমরা উদারতা ও কোমলতার সাথে আমাদের হাতে ন্যস্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি।

পরিশেষে পোপ মহোদয়ের কথার সাথে একাত্ম হয়ে *প্রার্থনা করি*: "হে পবিত্র আত্মা, এই ধরণীকে পিতার ভালবাসায় পরিচালনা কর; প্রসববেদনাতুর সৃষ্টির সঙ্গে তুমি পথ চল; আমাদের হৃদয়ে স্থান নাও, যাতে যা কিছু মঙ্গল তা যেন আমরা করতে পারি। "তোমার প্রশংসা হোক"!

(২) লাইদাতো সি-এর আলোকে পর্যালোচনা

বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে মানবজাতি যে সৃজনশীলতা ব্যবহার করে তা ঈশ্বর প্রদত্ত। বিজ্ঞান উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা অতি সাম্প্রতিককালে ডিজিটাল বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে, আমরা প্রতিদিন অসংখ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করি- বিদ্যুৎ, উড়োজাহাজ, যানবাহন, তথ্যপ্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি, ইত্যাদি যা আমাদের জীবনমানে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। অন্যদিকে, আমরা যদি মানব ইতিহাস বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাই যে, আমাদের জীবনযাত্রা অনেক জটিল হয়ে গেছে, প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনে আমরা অতি অভ্যস্ত এবং আসক্ত। মানুষের অতিমাত্রায় ভোগবাদী মনমানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা এবং উদাসীনতার কারণে সৃষ্টি-প্রকৃতি বন-বৃক্ষ নিধন, বাতাসে অতিমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড, কালো ধূয়া, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও দুর্গন্ধময় জল, জলাবদ্ধতা, খাল-ডোবা নিশ্চিহ্ন হওয়া, শব্দ দূষণ, জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, অনাবৃষ্টি, আবার কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি-বন্যা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব গোটা

মানবজাতি ও প্রকৃতিকে বিপর্যয় ও অকল্পনীয় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরিত্রী "যেন প্রসববেদনায় নিদারুণ কাতরাচ্ছে" (রোমীয় ৮:২২)।

গোটা বিশ্বে ধনী-গরীবের ব্যবধান, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখা যায় তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জীবনমানে। সমাজে বেশীরভাগ মানুষই নিজেদের সুবিধার দিকে নজর দেয় বেশি এবং প্রযুক্তিগত আরাম-আয়েশ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবের যে গুণাবলি ও আত্মসংযম লালন করা প্রয়োজন, আমরা তখন সেখান হতে দূরে সরে যাই। অন্যের প্রয়োজন, সুবিধা, বিপন্নতা দেখেও আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের অন্তরে মানবিকতা, দায়বোধ, মূল্যবোধ ও বিবেকবোধকে জাগ্রত করা, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন যেন আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারি (ধারা ১০৫)। আমরা বিবেকবান, দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে যেন সৃষ্টি-প্রকৃতির সৌন্দর্য সংরক্ষণ ও সৃষ্টি-প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করি; কেননা সৃষ্টি-প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরিমেয় ভালবাসার প্রকাশ।

যুগ যুগ ধরে কাথলিক চার্চ, বিশেষভাবে ধর্মগুরু পুণ্য পোপ মহোদয়গণের মাধ্যমে, সমসাময়িক বিষয় ও প্রশ্নের ওপর চার্চের চিন্তাধারা প্রকাশ করে থাকেন। "মানুষের প্রশ্ন - চার্চের ভাবনা" চলমান এই নীতিধারায়, ঐশপ্রত্যাদেশের আলোকে, মানুষ ও জগতের বিবেক হয়ে, বিভিন্ন সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে চার্চ তার শিক্ষা তুলে ধরেন। মানুষের সকল বিজ্ঞান ও বিদ্যার আপন স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে, চার্চ আশু ও জরুরী বিষয়ের উপর নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সামাজিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চার্চ মূলতঃ মানুষের জন্য 'চিন্তন-নীতি', 'কর্মকাণ্ডের নিদের্শনা' এবং 'মূল্যায়নের মাপকাঠি' তুলে ধরেন। একই ধারাবাহিকতায় আমাদের আবাস-গৃহ এই ধরিত্রীর যত্ন সম্বন্ধে পোপ ফ্রান্সিস চার্চের শিক্ষা সর্বজনীনপত্রে তুলে ধরেছেন।

পরিবেশ সংক্রান্ত "হোক তোমার প্রশংসা" (*LAUDATO SI*) দলিলে দুটো কেন্দ্রীয় বিষয় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে: প্রথম: পরিবেশকে নানা দৃষ্টিকোণ বা আদর্শবাদ অনুসরণ করে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ-বিবেচনা করা সঠিক হবে না; তাকে সামগ্রিকভাবে অথবা "সমন্বিত পরিবেশ" হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে "বিশ্বব্যাপী পরিবেশ-পরিবর্তন" এর প্রয়োজনীয়তা জরুরী হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ সমস্যা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল। পরিবেশের সমস্যা মূলতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। পোপ ফ্রান্সিস বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতাই তিনি এই দলিলে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন মানবজীবনের ভিত্তি হচ্ছে ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক; সে সম্পর্ক সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে, প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কটা অবহেলার কারণে পরিবেশের আজ বিপর্যয়; এটাই মানুষের পাপ। এই পাপ শুধু সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে নয়, মানুষের বিরুদ্ধে পাপ - বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বিরুদ্ধে পাপ। অতএব মানুষকে তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, মন পরিবর্তন করতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে।

(গ) Pope Francis, *Fratelli Tutti – "On Fraternity and Social Friendship"*, 2020;

বাংলা অনুবাদ, *ভ্রাতৃ-সকল: ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব*, সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ২০২৩ খ্রি.

"ভ্রাতৃ-সকল" *(Fratelli Tutti)* নামক বিশ্বজনীনপত্রটি, অক্টোবর ৩, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস প্রকাশ করেন। বিশ্বজনীন পত্রটি স্বরূপগত ভাবে সামাজিক যেখানে সাম্প্রতিক কালে মণ্ডলীর সর্বশেষ সামাজিক শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে "ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব"।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটির প্রেক্ষাপট: বিশ্বজনীনপত্র *"লাউদাতো সি"* (মে ২৪, ২০১৫ খ্রি.), আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত "বিশ্বশান্তি ও সমবেত বসবাসের জন্য করার জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব" শীর্ষক স্বাক্ষরিত চুক্তি" (ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৯ খ্রি.) এবং "কোভিড-১৯ এর বিশ্ব মহামারি" (২০১৯-২০২৩ খ্রি.)।

বিশ্বজনীনপত্রটির স্বরূপগত দিক হচ্ছে: ঐশতাত্ত্বিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক; এটি একটি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সর্বজনীন দলিল, কাথলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়াও অন্যের মতামত এখানে স্থান পেয়েছে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ধর্মসম্প্রদায়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে। সংক্ষেপে পোপ ফ্রান্সিসের এই বিশ্বজনীন পত্রটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র।

বিশ্বজনীনপত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে কী করে বিশ্বে আরও ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব নির্মাণ করা যায়? বিশ্বজননীন পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক জাতি ও প্রতিষ্ঠানের অবদানে, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বচেতনা সৃষ্টি করা। এই পত্রে আছে নতুন পৃথিবীর একটি সমন্বিত দর্শন ও মিশন।

বিশ্বজনীনপত্রে অধিক আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে আছে: (ক) মানবব্যক্তির মর্যাদা: সৃষ্টিকর্তা এক, একটি পরিবার যার মধ্যে আছে সকলের সম-অধিকার, ইত্যাদি; (খ) ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক: সংহতি, পারস্পরিক যোগাযোগ, ন্যয্যাতা, শান্তি, সংলাপ, ভ্রাতৃত্ব, মানব-ভ্রাতৃত্ব, ইত্যাদি। (গ) নৈতিক বিষয়সমূহ: ন্যায় যুদ্ধ, সহিংসা, যুদ্ধবিগ্রহ, পারমাণবিক অস্ত্র, মৃত্যু-দণ্ডাদেশ, গণমঙ্গল, বিশ্বের সম্পদের সর্বজীনন লক্ষ্য, দরিদ্রদের অগ্রাধিকার, অগ্রাসনী জাতীয়তাবাদ, আধুনিক দাসপ্রথা, সম্পদের প্রতি অধিকার, উদাসনীতার বৈশ্বায়ন, ইত্যাদি। (ঘ) সমাজ-বিজ্ঞান: রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজজীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশ ইত্যাদি। (ঙ) ধর্ম: ভ্রাতৃত্বের সেবায় নিয়োজিত, উত্তম দয়ালু শমরীয়, ইত্যাদি। (চ) ভালবাসার আদেশ: ঈশ্বরের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা।

(ক) বিশ্বজনীন পত্রের সারসংক্ষেপ

পোপ মহোদয় মনে করেন যে, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের পথ ধরে চললে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব অবদান রাখলে, আরও উন্নততর, ন্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নির্মাণ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন হবে যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক উদাসীনতাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা।

এই লক্ষ্যে পৌছানো কী সম্ভব? সাধু ফ্রান্সিসের চিন্তাভাবনা অনুসারে তা সম্ভব। কীভাবে? মানুষ এমন জীবন যাপন করবে যা মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে। সেই কাজ করার জন্য পোপ মহোদয় পত্রের মধ্য দিয়ে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের প্রতি প্রত্যাশা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একা একা এই কাজ সম্ভব নয়, একই মানবপরিবারে সকল ভাইবোন একই স্বপ্ন দেখতে হবে।

১ম অধ্যায়: আবদ্ধ জগতের উপর কালো মেঘপুঞ্জ

সাম্প্রতিক জগতে অনেক বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিদ্যমান: (ক) গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায্যতা সম্পর্কে শোষণাত্মক বিকৃত ধারণা; (খ) সামাজিক জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা; (গ) গণকল্যাণের প্রতি স্বার্থান্বেষী ও উদাসীন মনোভাব; (ঘ) অপচয়ের কৃষ্টি ও অধিক মুনাফা লাভের ওপর ভিত্তি করা বাজারচুক্তি; (ঙ) বেকারত্ব, জাতীয়তাবাদ, দারিদ্র; (চ) অধিকারের বৈষম্য: দাসত্ব, পাঁচার, নারীদের পরাধীন করে রাখা, ভ্রূণহত্যার জন্য চাপসৃষ্টি, দেহাঙ্গ পাঁচার, (ছ) “প্রাচীর গড়ার” কৃষ্টি, ইত্যাদি।

২য় অধ্যায়: পথের মধ্যে আগন্তুক (দয়ালু শমরীয়)

অন্ধকারময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দেখা যায় আলোকোজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত যা অনেক আশা সঞ্চার করে। আর সেই দৃষ্টান্ত হচ্ছে মঙ্গলসমাচারে রচিত *দয়ালু শমরীয়*-র ঘটনা। দয়ালু শমরীয় পথিমধ্যে একজন অচেনা ব্যক্তি। সমাজটা অসুস্থ, তারা কষ্টভোগী ও দুর্বল মানুষদের দেখেনা। কিন্তু আমরা দয়ালু শমরীয়র মতো অন্যের কাছে প্রতিবেশী হওয়ার জন্য আহ্বান পাই। সকল বদ্ধমূল ধারণা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, অতীতের সকল বাঁধা ছিন্ন করে সমাজে যারা পিঁছিয়ে পড়েছে তাদের প্রতি আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে, তাদেরকে আপন করে নেওয়ার, সম্পৃক্ত করার এবং কষ্টযাতনা থেকে মুক্ত করার। ভালবাসা যোগসেতু নির্মাণ করে কেননা “আমরা ভালবাসার জন্য সৃষ্ট হয়েছি”। খ্রিস্টানদের কাছে পোপ মহোদয় আহ্বান করছেন যেন যারা নিগৃহীত তাদের মধ্যে আমরা যেন যিশুকে দেখতে পাই।

৩য় অধ্যায়: একটি উন্মুক্ত জগত মানশ্চক্ষে দেখা ও রূপায়িত করা

এই অধ্যায়ে পোপ মহোদয় এমন একটি স্বপ্ন দেখেন যেখানে আছে একটি উন্মুক্ত জগৎ। তিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন যেন আমরা আমাদের "আমি" থেকে বের হয়ে "অন্যের মধ্যে" নিজেকে দেখে স্বপ্নের পূর্ণতা উপলব্ধি করি। আমাদের যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে তা একমাত্র ভালবাসা দ্বারাই পরিমাপ করা যায়। অপরের প্রতি ভালবাসাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ, যা স্বার্থচিন্তা থেকে বিরত রেখে অন্যের মঙ্গল বাসনার দিকে নিয়ে যায়। এই একাত্মতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ব পরিবার থেকেই জন্ম নেয়। পরিবারের এই মূল্যবোধগুলোকে প্রাথমিক ও প্রাণদায়ী শিক্ষার মাধ্যমে সুরক্ষিত করতে হবে।

মর্যাদা সহকারে জীবন যাপন করার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। এই অধিকারের কোন সীমানা নেই, কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না তা যেখানেই তার জন্ম হোক। এই মৌলিক অধিকারের ওপর ভিত্তি করেই "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিকতা" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি দেশে কেউ বিদেশী হয়ে থাকতে পারে না, কেননা দেশের সম্পত্তির উপর তার যে অধিকার তা অস্বীকার করা যাবে না। প্রত্যেকেরই প্রকৃতিগত ভাবে সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঋণ-গ্রহীতা দেশগুলো অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করার দায়বদ্ধতা আছে। তবে দরিদ্র দেশগুলোর জীবন ধারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঋণ-পরিশোধের বিষয়টা কোনভাবেই আপোষ করা যাবে না।

৪র্থ অধ্যায়: পুরো বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত এক হৃদয়

"পুরো বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত এক হৃদয়" শিরোনামে পোপ মহোদয় অভিবাসন বিষয়টি আলোচনা করেছেন। জীবনের সকল ঝুঁকি নিয়ে যারা যুদ্ধ, অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যায় মানবপাঁচার, তাড়িত হয়ে আপন শেকর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিবাসী বা শরণার্থী হয়েছে তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, রক্ষা করতে হবে, উন্নতি করতে হবে এবং তাদেরকে সমাজে আপন করে নিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অভিবাসন থেকে বিরত থাকতে হবে যেন তারা নিজেদের দেশে মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বাস করতে পারে। যে দেশ অভিবাসীদের গ্রহণ করে তাদের নিজস্ব জনগণের অধিকার এবং অভিবাসীদের অধিকারের মধ্যে একটা ভারসাম্যতা বজায় রাখতে হবে। মানবিক কারণে যারা অভিবাসন করে ও শরণার্থী হয় তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক যেমন: ভিসা প্রদান, মানবতার কারণে বসবাসের জায়গা করে দেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, নিরাপত্তা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিশ্চিত করা; কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিশুদের রক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, প্রভৃতি নিশ্চিত করা। যে বিষয়টা একান্ত প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রশাসন-ব্যবস্থা ও সহযোগিতা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ত্রাণসমগ্রী প্রদানের উর্ধে গিয়ে জনগণের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫ম অধ্যায়: উন্নততর ধরনের রাজনীতি

বর্তমান বিশ্বে একটি উন্নত ধরনের রাজনীতি প্রয়োজন, যে রাজনীতির মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাবে। এই ধরনের রাজনীতি গণকল্যাণের সেবার্থে নিয়োজিত, যা জনগণের গুরুত্ব দেয়, যা উদার ও উন্মুক্ত এবং যা সর্বদা জনগণের সাথে সংলাপ করতে উন্মুক্ত। পোপ ফ্রান্সিস এ ধরনের "জনগণমুখী" রাজনীতির কথা বলেন। এ ধরনের রাজনীতি "লোকরঞ্জনমূলক" রাজনীতি থেকে ভিন্ন কেননা "লোকরঞ্জনমূলক" রাজনীতি "জনগণ"-শূন্য রাজনীতি, যা জনগণের সমর্থন নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করে। উন্নততর রাজনীতি সামাজিক জীবনের অপরিহার্য, অর্থাৎ মানুষের শ্রমকে রক্ষা করে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য নতুন ধরনের রাজনীতি মানুষের মধ্যে একাত্মতা এবং অধঃস্তনদের স্বাধীনতার উন্নয়ন করে। উপরন্তু রাজনীতির কাজ হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অবস্থার মধ্যে এমন এক সমাধান খুঁজে বের করা যেখানে সামাজ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হবে না, দেহাঙ্গ, যুদ্ধাস্ত্র ও মাদকদ্রব্য বাজারজাতকরণ থেকে রোধ করা হবে, দাস্যশ্রম, সহিংসতা, সংঘবদ্ধ অপরাধ থেকে সমাজকে মুক্ত করবে। "মানবতার কলঙ্কের উৎস" মানবপাঁচার বন্ধ করা এবং ক্ষুধা নিবারণ করা, কেননা তা হচ্ছে মানুষের "অলঙ্ঘনীয় অধিকার"।

এমন রাজনীতি প্রয়োজন যেখানে গুরুত্ব দেয়া হবে "মানবমর্যাদা কেন্দ্রিক রাজনীতি" –– অর্থ-ভিত্তিক রাজনীতি নয়, কেননা বাজারমুখী রাজনীতি মানুষের সকল সমাধান দিতে পারে না। এ কারণে সাম্প্রতিককালে অনেক জনজাগরণমূলক আন্দোলন গড়ে উঠছে যা প্রণিধানযোগ্য কেননা সেখানে একটি নৈতিক শক্তির উদ্ভাবন দেখা যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় "জাতিসংঘের সংস্কারের" কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও প্রভাব থেকে জাতিসংঘকে মুক্ত করে "জাতিগণের পরিবার" স্বরূপ ধারণায় প্রবুদ্ধ হয়ে গণমঙ্গলের জন্য, দারিদ্র বিমোচনের জন্য, মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ কাজ করবে। অবিরাম "সমঝোতা, মধ্যস্থতা এবং সালিসি"-র মাধ্যমে, "শক্তির বিধান না হয়ে বিধানের শক্তি" হয়ে জাতিসংঘ কাজ করে যাবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ সমাজে সংলাপ এবং বন্ধুত্ব

সমাজে সংলাপ ও বন্ধুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পোপ মহোদয় নতুন ধরনের জীবন-ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারা একটি শৈল্পিক বিষয়। যারা প্রান্তিক জগতে অবস্থান করছে এবং যারা আদিবাসী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, কেননা তাদের কাছ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। সমাজে কেউই অপ্রয়োজনীয় নয়, কাউকেই ফেলে দেওয়া যায় না। আদিম ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে আছে "দয়াশীলতার" অলৌকিক কীর্তি, যা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে কেননা "অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল আলোর মত" তা কাজ করে এবং তা "জগতের সাম্প্রাতিক সকল নৃশংসতা..., উদ্বিগ্নতা..., কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত করতে পারে"।

৭ম অধ্যায়ঃ পুনরুজ্জীবিত সাক্ষাতের পথসমূহ

এই অধ্যায়ের মধ্যে পোপ মহোদয় শান্তির মূল্যবোধ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি গুরুত্বের সাথে বলছেন যে, "শান্তি আসলে সত্য, ন্যায্যতা ও দয়ার" সাথে সংযোজিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে প্রতিহিংসা তো নেই-ই, বরঞ্চ ইতিবাচক একটা ভাব নিয়ে এমন সমাজ গড়ে তোলা যার ভিত্তি হবে অন্যের সেবা করা এবং পুনর্মিলন ও পারস্পরিক উন্নয়নের পথ অনুসরণ করা। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এমন একটি শৈল্পিক কাজ যেখানে সবাই জড়িত, প্রত্যেকের কিছু না কিছু করার আছে এবং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া যা কোন দিনই শেষ হবে না। ক্ষমা ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়। আমরা সবাইকে ভালবাসব, তার কোন ব্যতিক্রম নেই; যারা নিপীড়ন করে তাদেরকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে তার মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আনা যাতে সে তার প্রতিবেশীকে আর নিপীড়ন না করে। ক্ষমার অর্থ দণ্ড থেকে মুক্তি নয়, বরং ন্যায্যতার সাথে স্মরণ করা। ক্ষমার অর্থ এ নয় যে, সব ভুলে যাওয়া, কিন্তু মন্দের বিধ্বংসী ক্ষমতা ত্যাগ করা এবং প্রতিহিংসা বর্জন করা হচ্ছে ক্ষমা। নাৎসিদের দ্বারা "শোয়াহ্" এর বিভৎসতা, হিরোশিমা ও নাগাসিকার পারমাণবিক আক্রমণ এবং আরও অনেক নির্যাতন ও জাতিগোষ্ঠির বিলোপন, প্রভৃতি ঘটনা ভোলার নয়। এগুলো স্মরণ রাখতে হবে যাতে আমাদের স্মৃতির বিলোপ না ঘটে এবং যাতে সামগ্রিক বিবেক-শিখা যেন সর্বদাই জীবন্ত থাকে।

"ন্যায় যুদ্ধ"

এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় স্মরণ করেন যে, যুদ্ধের হুমকি সর্বদা চলছে, "যুদ্ধ মানুষের অধিকারের বঞ্চণা", "রাজনীতি এবং মানবতার ব্যর্থতা", এবং "মন্দ শক্তির সামানে পরাজয়" স্বীকার। পারমাণবিক যুগে আমরা আগের মতো ভাবতে পারিনা যে, "ন্যায় যুদ্ধ" বলতে কিছু আছে। আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে "আর নয় যুদ্ধ"। পারমাণবিক অস্ত্র পরিহার করা নৈতিক ও মানবিক নির্দেশ। যুদ্ধাস্ত্রের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা দিয়ে যেন "বিশ্ব ফাণ্ড" গঠন করা হয় যাতে জগত থেকে ক্ষুধা বিদূরিত হয়।

মৃত্যুদণ্ড

পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্ট করে বলেছেন যে, "মৃত্যুদণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়, বিশ্বব্যাপী তা যেন বাতিল করা হয়"। "মানব জীবন পবিত্র", সবার জীবনের প্রতি সবার শ্রদ্ধা থাকতে হবে। কেউ যদি অন্যকে হত্যা করে তখনও কিন্তু সে তার ব্যক্তিজীবনের মর্যাদা হারায় না। কোন কারণে, যাদের জন্ম হয় নি, যারা দরিদ্র, যারা প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধ তাদের জীবন কোনভাবে কেড়ে নেওয়া যাবে না।

৮ম অধ্যায়ঃ এ জগতে ভ্রাতৃত্বের সেবায় ধর্মসমূহ

"আমাদের জগতে ভ্রাতৃত্বের সেবায় নিয়োজিত ধর্মসমূহ" এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, জগতে যে সহিংসতা আছে তা ধর্মের কারণে নয় কিন্তু শাস্ত্রের কিছু ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণে, আর রয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র,

অন্যায্যাতা এবং নিপীড়ন-নীতি। শান্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামর্থ আছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা সকল ধর্মবিশ্বাসীদের মৌলিক অধিকার সেই মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করতে হবে।

মণ্ডলীর ভূমিকার কথাও বিশ্বজনীনপত্রে বলা হয়েছে। মণ্ডলীর মিশন শুধু মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদিও মণ্ডলী রাজনীতি করে না, তথাপি মঙ্গলসমাচারের আলোকে মানুষের জীবনে রাজনৈতিক দিক, গণমঙ্গলের প্রতি মনোযোগ এবং সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয় অবহেলা করতে পারে না এবং এ ব্যাপারে তার ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না।

পরিশেষে পোপ ফ্রান্সিস, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আবুধাবিতে, আল-আজারে গ্রাণ্ড ইমাম, আহম্মদ আল-তাইইবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত "বিশ্বশান্তি ও সমবেত বসবাসের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব" শীর্ষক চুক্তিটির কথা উল্লেখ করেন। এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি মাইলফলক হয়ে আছে। তিনি উক্ত চুক্তি অনুসরণের জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়ে বলছেন যে, মানব-ভ্রাতৃত্বের নামে সংলাপ যেন আমাদের পথযাত্রা, আচরণে সমবেত সহযোগিতা এবং পারস্পরিক জ্ঞানের জন্য প্রধান পদ্ধতি ও নীতি হয়ে থাকে।

(খ) সামাজিক ন্যায্যতা বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিসের চিন্তাধারা

কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই পোপ ফ্রান্সিস এই শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মণ্ডলীর এবং পোপ ফ্রান্সিসের সামাজিক ন্যায্যাতার সম্বন্ধে মৌলিক কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

(১) মানব মর্যাদা: কাথলিক মণ্ডলী তার শিক্ষায় মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মর্যাদাকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা দিয়ে থাকে। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে সামাজিক ন্যায্যতা হচ্ছে মানব ব্যক্তির প্রেক্ষাপট, সামাজিক অবস্থান অথবা আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে, মানবজীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মর্যাদা স্বীকৃতি দেওয়া এবং তা অক্ষুন্ন রাখা।

(২) একাত্বতার বন্ধন: পোপ মহোদয় একাত্মতার বন্ধন সম্পর্কে বারবার জোর দিয়ে থাকেন যার অর্থ হচ্ছে পরস্পরের সমর্থনের জন্য একসঙ্গে অবস্থান নেওয়া। তিনি কাথলিকদের এবং সকল বিশ্বাসী জনগণের উৎসাহিত করেন যাতে আরও ন্যায্য ও সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যেখানে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে।

(৩) দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের যত্ন নেওয়া: কাথলিক মণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, সমাজ যেন দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। এর মানে হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন, অভাবীদের প্রয়োজন মেটানো এবং ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা, যেমন খাদ্য, বিশুদ্ধ পাণীয় জল, স্বাস্থ্যসেবা, এবং শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

(৪) আর্থিক ন্যায্যতা: পোপ মহোদয় ভোগবাদ এবং অসমতার "ছুড়ে-ফেলা-কৃষ্টি"কে অনেক সমালোচনা করেছেন। তিনি এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে কথা বলেন যা হবে সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক, এবং সম্পদের সম-বন্টন মূলক।

(৫) পরিবেশ-ন্যায্যতা: পোপ মহোদয় পরিবেশ-ন্যায্যতার বিষয়ক "লাউদাতো সি" নামক একটি মাইলফলক বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ করেছেন। এই পত্রটি পরিবেশ বিষয়ক অনেক সমস্যা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন যা বিশ্বের দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির ওপর প্রভাব ফেলছে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, পরিবেশের যত্ন নেওয়া সামাজিক ন্যায্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, কারণ পরিবেশের অবক্ষয় ঘোরতর ভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে।

(৬) **শান্তির পক্ষ-সমর্থন:** পোপ ফ্রান্সিসসহ কাথলিক মণ্ডলী শান্তির পক্ষে এবং অহিংসামূলক পদ্ধতি ব্যাবহার করে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সমাধান করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা সামাজিক ন্যায্যতার অবিচ্ছেদ্য একটি দিক কেননা যুদ্ধ ও সহিংসতা সাধারণ মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায়।

(৭) **অন্যায্যাতা বিরুদ্ধে পদক্ষেপ:** কাথলিক মণ্ডলী ও পোপ মহোদয় প্রত্যেক ব্যক্তি ও সরকারের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা সামাজিক ন্যায্যতার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সকল বৈষম্য, জাতীয়তাবাদ, মানব-পাঁচার, এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পোপ মহোদয় বলেন যে, এই সব বিষয়ে প্রতিকার করতে এবং আরও ন্যায্য এবং সহমর্মী সমাজ গড়ে তুলতে আমরা যেন তৎপর থাকি।

সংক্ষেপে, কাথলিক শিক্ষার মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতা একটি অভিন্ন অংশ। পোপ মহোদয় এই বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ, এবং জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা ন্যায্য, সম ও সহমর্মী জগত নির্মাণ করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আপন মর্যাদা সম্মানিত হয় এবং সুরক্ষিত হয়।

উপসংহার: পোপ ফ্রান্সিস – ন্যায়, দয়া ও শান্তি

গত বছরে ইতালির "বিচার বিভাগের উচ্চ পরিষদ"-এর সভা-অনুষ্ঠানে পোপ ফ্রান্সিস যে সমস্ত কথা বলেছেন তার সবকিছু পুনরুল্লেখ না করে কয়েকটি উক্তির মাধ্যমে তার উপদেশ ও চিন্তাভাবনা অত্র প্রবন্ধের উপসংহারে উপস্থাপন করছি:

পোপ মহোদয় বলেন:

"বিচার ন্যায়নিষ্ঠ হতে হলে প্রয়োজন হবে সত্য, আস্থা, বিশ্বস্ততা ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতা" ।

"ন্যায়ের জন্য কাজ করা একদিকে একটি দান এবং অন্যদিকে দায়িত্ব – যা মানুষের মর্যাদা ও গণমঙ্গলের সেবায় নিয়োজিত"।

"যারা ন্যায্যতার জন্য কাজ করে তারা কণ্ঠহীনদের এবং অন্যায়ভোগীদের কণ্ঠস্বর হতে আহূত।"

মণ্ডলীতে যারা ন্যায্যতার জন্য কাজ করে তাদেরকে, যখন মণ্ডলীর কোন ব্যক্তির অসদাচারন "মণ্ডলীর শ্রীমুখ নষ্ট হয় এবং বিঘ্ন নিয়ে আসে" সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হয়, সেখানে "ন্যায়বিচার ও দয়ার মধ্যে একটা ভারসাম্যতা আনতে হবে"। এ সবের মধ্যে "সুক্ষ অবধারণ অনুশীলন" করতে হবে এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতি, বিচক্ষনতার সাথে অনুসরণ করলে সেই ভারসাম্যতা অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে।

ন্যায্যতর ঐতিহ্যগত সংজ্ঞা হল – যার যা প্রাপ্য তাকে তা দান করা। পোপ মহোদয়ের প্রশ্ন: "প্রাপ্য কীভাবে ব্যাখ্যা করব", "বাস্তবে তাদের প্রাপ্য কী"। এরূপ প্রশ্ন করা হয় কারণ স্থান ও কাল ভেদে "প্রাপ্য"-এর অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। পোপ মহোদয় বলেন যে, বাইবেলের আলোকে "প্রাপ্য হচ্ছে মানুষের মর্যাদাকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া"।

পোপ মহোদয় বলেন যে, ক্ষতিপূরণমূলক, পুনরুদ্ধারমূলক অথবা পুনর্মিলনাত্মক "ন্যায্যতা, যা পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়া, সেই ন্যায্যতাই হচ্ছে প্রতিশোধ ও স্মৃতিবিলোপনের খাঁটি প্রতিষেধক, কেননা এরূপ ন্যায্যতা বিচ্ছিন্ন বন্ধনকে পুনর্গঠন করে এবং ভাইয়ের রক্তের দ্বারা রঞ্জিত ভূমি পুনরুদ্ধার করার সুযোগ করে দেয়।"

পোপ বলেন যে,

"দয়া এবং ন্যায্যতা পরস্পরের বিকল্প নয়, পক্ষান্তরে উভয়ে একই লক্ষ্যে একসঙ্গে যাত্রা করে, কেননা দয়া কোন সময় ন্যায্যতা রহিত করে না বরং পূর্ণতা দান করে"।

"সত্য ও স্বাধীনতার ওপর ভর করে ন্যায্যতা সব সময়ই শান্তির সন্ধানে সহযাত্রী হবে।" "ন্যায়ের পথ ধরে শান্তির অন্বেষণ" করতে হবে।

"যারা অন্যায়ের শিকার বা ভুক্তভোগী তাদের সঙ্গে একাত্মতা ন্যায্যতাবোধকে পরিপুষ্ট করবে এবং ন্যায় ও শান্তির রাজ্যে আগমনের প্রত্যাশা কোন সময় নির্বাপিত হবে না।"

"ন্যায্যতা বিহীন শান্তি কোন আসল শান্তি নয়"।

ইইক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, "শান্তির জন্য প্রচেষ্টার অর্থ হচ্ছে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা"।

"ন্যায্যতা এমনই একটি গুণ যা জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। অন্যান্য নৈতিক প্রধান গুণ, সদ্বিবেচনা, সৎসাহস ও সংযম ন্যায্যতার দ্বারা অনুশীলন করতে হবে। "

Resources

(১) *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, বাংলা-সম্পাদক: কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, সিবিসিব, ২০০০ খ্রি.

(২) *Compendium of the Social Doctrine of the Church,* Pontifical Council for Justice and Peace, 2004, *খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ*, অনুবাদ ও সম্পাদনায়: সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ঢাকা, ২০১০ খ্রি.

(৩) Pope Francis, *Evangelii Gaudium – "The Joy of the Gospel" 2013,* অনুবাদ: *মঙ্গলবার্তার আনন্দ*, অনুবাদ-সম্পাদক: সিস্টার শিখা লিটিশিয়া গমেজ, সিএসসি, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.

(৪) Pope Francis, *Laudato Si' – "Praised Be to You"* – Encyclical Letter on the Care for Our Common Home, 2015. অনুবাদ: *তোমার প্রশংসা হোক – আমাদের অভিন্ন বসবাটির যত্ন, কারিতাস বাংলাদেশ*, ২০১৬ খ্রি.

(৫) Pope Francis, *Fratelli Tutti – "On Fraternity and Social Friendship"*, 2020; বাংলা অনুবাদ *ভ্রাতৃ-সকল: ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব*, সিবিসিবি ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ২০২৩ খ্রি.

(৬) কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, *শিক্ষা ও সেবা*, কার্ডিনাল-পরম্পরা প্রকাশনা, ২০২৩ খ্রি.

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.

"প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী আমরা"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

তপস্যাকালের তীর্থযাত্রা: চল্লিশ দিনের তীর্থযাত্রা

- ভস্মটিকা কপালে চিহ্নিত করে যিশুকে অনুসরণ করার যাত্রা: "ফিরে এসো"। তপস্যাকালের যাত্রা: প্রার্থনা, দয়াভিক্ষা ও উপবাস (ভস্মবুধবার)
- মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রা: পরীক্ষা ও প্রলোভন জয় করা (১ম রবিবার)
- পর্বতে আরোহনের যাত্রা: দিব্য রূপান্তর (২য় রবিবার)
- মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা: ঈশ্বরের গৃহ (মন্দির) ও আমার গৃহ-মন্দির (আজ্ঞা) (৩য় রবিবার)
- সমতলে দরিদ্র মানুষের উদ্দেশে যাত্রা (৪র্থ রবিবার - কারিতাস)
- ভক্তি-ভালবাসার উদ্দেশ্যে পাপীদের যাত্রা (মাদলেনের আচরণ – ৫ম রবিবার)
- জেরুশালেমের উদ্দেশে যাত্রা –পুণ্য সপ্তাহ – যাতনা-মৃত্যু ও গৌরবের উদ্দেশ্যে)

মণ্ডলীর ২০২৫ বর্ষপূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ-এর মূলভাব: "প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী আমরা"

খ্রিস্টমণ্ডলীতে **জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা** বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস **১৩০০** খ্রিষ্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ

চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং "পাপের পূর্ণদণ্ডমোচন"। পরবর্তীতে **১৪৭৫** খ্রিষ্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পলের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর **"পুণ্য দ্বার"** উম্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী **২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলী** হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা **তীর্থ সবসময় *প্রত্যাশা* জাগ্রত করে**। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রত্যাশাই পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ" (১২:২)।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলীর জন্য যে মূলভাব বেছে নিয়েছেন তা হল: **"প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী আমরা"**। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "যে আশা আমরা দান রূপে পেয়েছি তা উজ্জীবিত করতে হবে, নতুন শক্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য অপরকে সাহায্য করতে হবে, যেন তারা ভবিষ্যতের দিকে উম্মুক্ত চিত্তে তাকাতে পারে, তারা যেন পেতে পারে ভরসাপূর্ণ হৃদয় ও দুরদর্শী দর্শন। আসছে জুবিলী প্রত্যাশার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, নবায়ন ও নব জন্মের জন্য ভরসা জাগাতে পারে, যা আমরা কতো জরুরিভাবে বাসনা করছি। এ কারণে আমি জুবিলীর মটো হিসেবে বেছে নিয়েছি: "প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী আমরা"।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত **নিসীয় মহাসভার ১৭০০** বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমাণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই প্রসঙ্গে বলেন: "জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্তি যতোই এগিয়ে আসছে ততোই আমরা আহ্বান পাচ্ছি প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করতে যেন খ্রিষ্টান জনগণ পুণ্যবর্ষের পালকীয় বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।"

২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষ: উৎসর্গ করা হবে প্রার্থনা-বর্ষ হিসেবে। প্রার্থনার ব্যপারে পোপ মহোদয় একটি চিঠিতে উল্লেখ করে বলেন যে, "প্রার্থনা সর্ব্বোপরি যেন এক মহান "ঐকতান" রূপে প্রতিধ্বনিত হয়; প্রভুর সামনে অবস্থান করার বাসনাকে নবায়িত করে, তাঁর বাণী শুনতে এবং তাঁর আরাধনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। উপরন্ত, প্রার্থনা যেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সকল ভালবাসার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং সকল সৃষ্টিকাজের জন্য প্রশংসা করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রার্থনা পবিত্রতা লাভের রাজকীয় পথ; কর্মযজ্ঞের মধ্যে ধ্যানী হতে আমাদের সক্ষম করে। সংক্ষেপে, প্রার্থনা যেন বর্ষকালীন প্রার্থনার গভীরে নিয়ে যায় যেখানে আমাদের হৃদয় উম্মুক্ত করে যাতে আমরা ঈশ্বরের বর্ষিত অনুগ্রহ ধারা প্রবাহিত হতে পারে যাতে যিশুর শেখানো "প্রভুর প্রার্থনা" যিশুর প্রত্যেক শিষ্যের জীবনযাপনের কমসূচি হয়ে ওঠে" (জুবিলী উপলক্ষে পরিপত্র", ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি.)

২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ: রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক"-এর প্রধান, কার্ডিনাল রিনো ফিসিচেল্লা'র উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত - ২০/০৯/২০২২) (জানুয়ারি ১৯, ২০২৪ খ্রি.)

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী - ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ : "ঐশ-পরিচালনাঃ মরুপথ দিয়ে মুক্তি উদ্দেশ্যে যাত্রা"

ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁর বাণী সর্বদাই মুক্তির বাণী: ***"আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন"*** (যাত্রা ২০:২)। এই কথাগুলি ছিল সিনাই পর্বতে মোশির নিকট প্রদত্ত দশ-আজ্ঞার প্রথম বাণী।

মরুভূমিতে তারা মুক্তির উদ্দেশ্যে রাস্তা-পথ স্বরূপ **"দশটি বাণী"** লাভ করেছে; তাৎক্ষণিক ভাবে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় নি। একটি যাত্রার অংশ হিসেবে সাড়াদানটি পরিপক্ক হতে হয়েছে।

মরুপ্রান্তরে যাত্রারত ইস্রায়েল জাতি যেমন **মিশরের দাসত্ব** আঁকড়ে ধরে ছিল, অতীতকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পরমেশ্বর প্রভু এবং মোশীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল – আজও ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের জনগণ পেছনে-ছেড়ে-আসা নিপীড়িনমূলক দাসত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে।

আমরা যখন **জীবনে হতাশ** হয়ে পড়ি, মরুপ্রান্তরে ঘুরে মরি, গন্তব্য স্থান সেই প্রতিশ্রুত দেশের সন্ধান যখন না পাই, তখন এই অবস্থা যে কতো সত্য তা আমরাও উপলব্ধি করি।

তপস্যাকাল হচ্ছে ঐশ-অনুগ্রহের কাল, যে সময়ে প্রবক্তা হোসেয়ের কথা অনুসারে, মরুভূমি প্রথম ভালবাসার একটি স্থান হয়ে উঠতে পারে (দ্রঃ হোসেয়া ২:১৬-১৭)। ***দাসত্বকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর জনগণকে গড়ে তুলেন,*** মৃত্যু থেকে জীবনে নিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সক্ষম করে তুলেন। বরের মতো, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের কথা কানে কানে ব'লে তিনি আমাদেরকে আবারও নিজের কাছে টেনে নেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা কোন তাত্ত্বিক বিষয় নয়। জ্বলন্ত ঝোপ থেকে ঈশ্বর যখন মোশীকে ডাকলেন, তখন তিনি প্রকাশ করলেন এমন একজন হিসেবে, *যিনি দেখেন এবং সর্বোপরি যিনি শ্রবণ করেন:* "মিশর দেশে আমার আপন জাতির দুঃখদুর্দশা কতখানি, তা আমি দেখেছি, দেখেইছি। তাদের কর্মকর্তাদের অত্যাচারে তারা যে কেমন ক্ষোভের হাহাকার ক'রে থাকে, তাও শুনেছি আমি। হ্যাঁ, তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা আমার জানাই আছে। তাই আমি মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। এই দেশ থেকে তাদের নিয়ে যেতে চাই এমনই-এক দেশে, যা বিস্তীর্ণ উর্বর, এমনই-এক দেশে, যেখানে বয়ে চলে দুধ ও মধুর স্রোত" (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)।

আজও কত ***নিপীড়িত ভাই-বোনের আর্তনাদ*** ঊর্ধ্বলোকে শোনা যায়। এসো আমরা প্রশ্ন করিঃ তাদের আর্তনাদ কি আমরা শুনতে পাই? সেই আর্তনাদ কি আমাদের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে? সেই আর্তনাদ কি আমাদের স্পর্শ করে?

সাম্প্রতিক ***"উদাসীনতার বিশ্বায়ন"-এর*** বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি দুটো প্রশ্ন করেছিলাম: *"আদম তুমি কোথায়?"* (আদিপুস্তক ৩:৯) এবং *"তোমার ভাই কোথায়?"* তপস্যাকালে আমাদের যাত্রা বাস্তবে ফলদায়ী হয়ে উঠবে যদি উপরোক্ত প্রশ্ন দুটি আবার শ্রবণ ক'রে, আমরা যদি অনুভব করি যে, আজও আমরা রাজা ফারাও-এর রাজত্বে বাস করছি। এই রাজত্ব আমাদেরকে ক্লান্ত এবং উদাসীন করে রাখছে।

এমন এক উন্নয়ন মডেলের মধ্যে আছি যা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করছে, আমাদের ভবিষ্যত লুণ্ঠিন করছে। মাটি, বায়ূ এবং জল দুষিত হচ্ছে, একই ভাবে আমাদের প্রাণও দূষিত হচ্ছে। একই ধরনের অতি অভ্যস্থ নিরাপত্তার দিকে আমাদের আকর্ষন রয়েছে, যা আমাদের মুক্তির পরিপন্থী। আমরা কি নতুন জগত দেখতে চাই? পুরনোর সাথে আপোষ মিমাংসা ত্যাগ করতে প্রস্তুত?

আমাদেরকে ***"আশার অভাব"-এর*** বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে কেননা "আশার অভাব" আমাদের সকল স্বপ্ন গলাটিপে মেরে ফেলছে এবং মানুষের নীরব আর্তনাদ ঊর্ধে উত্তোলিত হচ্ছে এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করছে।

এই "আশার অভাব" ইস্রায়েল জাতির দাসত্ব-কাতরতা থেকে ভিন্ন নয়, কেননা এই কাতরতা ইস্রায়েল জাতিকে মরুভূমিতে অচেতন করে রেখেছে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে প্রতিহত করেছে। মানবজাতির যাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, নতুবা বর্তমান অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। যখন দেখি মানবজাতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং বিচার-বিধানে উন্নয়ন সকলের মানবমর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম, তখনও কেন মানবজাতি অসমতা ও সংঘর্ষের অন্ধকারে হাতরিয়ে চলছে!

আমাদেরকে নিয়ে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। এসো আমরা তপস্যাকালটিকে একটি মহান কাল হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমাদের নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই ঈশ্বরের কথা: "আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাকে মিশর দেশের বাইরে, দাসত্বের সেই বাসভূমির বাইরে নিয়ে এসেছি" (যাত্রা ২০:২)। তপস্যাকাল হচ্ছে *পরিবর্তনের সময়, মুক্তির সময়*।

ঈশ্বর চান না যে, ইস্রায়েল জাতি সেই রাজার অধীনে প্রজা হয়ে থাকবে, বরং ***তিনি চান যেন আমরা তার পুত্র ও কন্যা*** হিসেবে থাকি। মরুভূমি এমনই একটি জায়গা যেখানে আমাদের স্বাধীনতা পরিপক্ক হতে পারে যাতে পূর্বের দাসত্বের দিকে ফিরে না যাওয়ার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি।

এ সবের মানে হচ্ছে সংগ্রাম করতে হবে – যা যাত্রাপুস্তক এবং মরুপর্বতে যিশুর পরীক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার একান্ত প্রিয়জন" (মার্ক ১:১১) এবং "আমি ছাড়া তোমার যেন আর কোন দেবতা না থাকে" (যাত্রা ২০:৩),

আমাদের ভয় করতে হবে সেই সমস্ত দেবতা যা আমরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছি। আমরা টাকাপয়সার প্রতি, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প, কয়েকটি ধারণা ও লক্ষের প্রতি, আমাদের পদ ও ঐতিহ্য প্রতি, এমন কি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে যেতে পারি।

এই তপস্যাকালে ***কাজ করার অর্থ হচ্ছে নীরব হওয়া (ক্ষণিকের জন্য থাম), প্রার্থনায় নীরব হওয়া*** যাতে আমরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে পারি, দয়ালু সামরীয়র মতো *আঘাতে ক্ষত ভাইবোনদের সামনে* নীরবে দাঁড়াতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আর মানুষে প্রতি প্রেম একই প্রেম।

এই কারণেই প্রার্থনা, ভিক্ষাদান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়, বরং একই ক্রিয়ার উম্মুক্ততা এবং আত্ম-ত্যাগ, যার মাধ্যমে আমরা সকল দেবমূর্তিকে বিতারণ করি কেননা তা আমাদের অথর্ব করে রাখে, আসক্তিকে ত্যাগ করি যা আমাদের বন্দী করে রাখে। এই ধর্মক্রিয়াত্রয়ের সাধনা আমাদের শীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হৃদয় পুনর্জীবিত করবে। ধীরে চলো, একটু থামো! তপস্যাকাল আমাদের জীবনের ধ্যানী দিকটা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করে।

ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই ভাইবোন হয়ে যাই, পরস্পরের প্রয়োজনে আমরা আরও সচেতন হই, যার ফলে তারা হুমকী ও শত্রু স্বরূপ না হয়ে আমাদের যাত্রাপথে সঙ্গী ও সহযাত্রী বলে উপলব্ধি হয়। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বপ্ন, আমাদের প্রতিশ্রুত দেশ – যে-দিকে আমরা যাত্রা করি আমাদের দাসত্ব ছেড়ে।

আমাদের কাছে যিশু বলেন: "তোমরা যখন উপোস কর, তখন **ভণ্ডদের মতো** বিষন্ন ভাব দেখিয়ো না। তারা যে উপোস করছে, সেটা লোকদের দেখাবার জন্যেই তো তারা মুখখানা অমন শুকনো করে রাখে" (মথি ৬:১৬)। পক্ষান্তরে অন্যেরা হাসিমুখ দেখুক, মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক এবং ভালবাসা উপলব্দি হোক যে ভালবাসা সবচাইতে ক্ষুদ্র ও কাছের মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে।

যতটুকু এই তপস্যাকাল পরিবর্তনের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে, ততখানি বিপর্যস্ত মানবতা সৃজনশীলতার স্ফূরণ ঘটাবে, এবং নতুন আশার আলো দেখাবে।

তদ্‌সত্ত্বেও অতি সাহসভরে এমন একটি জগতের স্বপ্ন চোখের সামনে রাখতে পারি, যেখানে মাত্র মৃত্যুর বিভেষিকা নয়, বরং প্রসব-বেদনাশ্রিত একটি জগত দেখতে পাই; ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, কিন্তু ইতিহাসের আরেকটি নতুন

অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে জগতকে দেখতে পারি। সেটাই হচ্ছে পরিবর্তনের সাহস যা দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষণেই জন্ম নেয়।

তিনটি ঐশগুণের মধ্যে আছে **বিশ্বাস, ভালবাসা আর আশা;** বিশ্বাস ও ভালবাসা ছোট্ট বোন "আশা"কে হাত ধরে নিয়ে চলে, আশাকে পথ চলতে শেখায় এবং একই সময়ে আশা তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়।

আশা জাগ্রত করার জন্য আমাদের কী করতে হবে? (পোপ ফ্রান্সিস)

- ঈশ্বর যেখানেই তোমাকে রোপন করেছে সেখানেই তোমাকে সর্বদা আশায় জাগ্রত থাকতে হবে।
- তোমার এক নম্বর শত্রু কোন বাইরের শত্রু নয়; "জীবনের তিক্ততা ও অন্ধকারময় চিন্তা স্থান দিও না"
- "তোমার জীবনে অনেক মহৎ ও সুন্দর সত্য আছে"; ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ, যা-কিছু ভাল সেই দিকে পবিত্র আত্মার শক্তি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে; তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে "খ্রিস্টের আলিঙ্গণ"-এর দিকে।
- যারা বিশ্বাসী তারা একা নয়। অন্যেরা আছে যারা আশা করে। "জগত চলতে থাকে, কারণ কতো মানুষ আছে তাদের একটা দর্শন আছে যা তাদের কাছে নতুন দিগন্ত/পথ খুলে দেয়, তারা সেতুবন্ধন তেরী করে, তারা স্বপ্ন দেখে এবং বিশ্বাস করে, এমন কি সেই মুহূর্তে যখন তারা নানা ভাবে তিরষ্কৃত হয়।"
- মনে করো না কখনো যে, তোমার জীবনের সংগ্রাম নিরর্থক। ঈশ্বর আমাদেরকে হতাশ করেন না এবং যে বীজ তিনি রোপন করেছেন তা একদিন অঙ্কুরিত হবে। "আমরা একদিন প্রস্ফুটিত হবই" ।
- "যেখানে তুমি আছ, সেখানেই তুমি গড়তে শুরু কর" ।
- জীবন যখন দুর্বিসহ, 'যেখানে তুমি পড়ে গেছো, সেখান থেকে তুমি ওঠো, মাটিতে পড়ে থেকো না; উঠে দাঁড়াও, অন্যেরা তোমাকে দাঁড়াতে সাহায্য করুক"।
- তুমি যদি নিচে পড়ে থাক, ওঠে দাঁড়াও, আবার যাত্রা শুরু কর।
- "ভাল কাজ করতে করতে যদি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকো", "যদি তোমার মধ্যে শূন্যতা, হতাশা আসে, পবিত্র আত্মাকে ডাক, তাকে তোমার শুণ্যতা পূর্ণ করতে বল।
- অন্যদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ কর।
- "যারা ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতা" ছড়ায় তাদের কথা শোন না।
- আমাদের মধ্যে যতোই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, "মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যেন একসঙ্গে তারা বাস করতে পারে। অমিলের মধ্যে ধৈর্য্য ধরো। একদিন তুমি আবিষ্কার করবে যে তোমার মধ্যে সত্যের রজতরশ্মী ন্যস্ত রয়েছে।"
- জনগণকে ভালবাস। প্রত্যেকের জীবযাত্রাকে শ্রদ্ধা কর – সেই রাস্তা যতোই ঝুঁকিপূর্ণ হোক, অথবা সংকীর্ণ পথ দিয়ে যতই সোজা তোমাকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে; কেননা প্রত্যেকের জীবনে তো একটা গল্প রয়েছে।
- প্রতিটির শিশুর জন্ম "নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি যা প্রমাণ করছে যে, তা মৃত্যুর চাইতে শক্তিশালী"।
- যিশু আমাদের আলো দিয়েছেন যা অন্ধকারে জ্বলতে থাকে; আলো নিভতে দিও না, রক্ষা করো। এই আলো হচ্ছে তোমার জীবনের সম্পদ যা দিয়ে তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"
- নতুন জগতের স্বপ্ন দেখ, দেখা যাচ্ছে না এখন, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই দেখা যাবে। সেই সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা কর: যারা সমুদ্র যাত্রা করেছে, যারা পর্বতে আরোহন করেছে, যারা দাসত্ব জয় করেছে, বা মানুষের জন্য যারা মঙ্গলতর জীবন জনগণের জন্য নিয়ে এসেছে।
- দায়িত্বশীল হও: "যারা গরিব তাদের জন্য প্রতিটি অন্যায় একট বড় ক্ষত; তোমার পরে অসংখ্য প্রজন্ম সেই ক্ষত নিয়ে জীবন যাপন করবে"।
- প্রতিদিন সাহস পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। "স্মরণে রাখ যিশু সকল ভয়-ভীতি জয় করেছে।" "আমাদের আপন অবিশ্বস্ত শুত্রুও আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না।"

- যদি কোন ভয়-ভীতি আসে, স্মরণ করো যে, যিশু তোমার মধ্যে বাস করেন। আর তোমার মধ্য দিয়েই তিনি মানবতার সকল শত্রুকে: পাপ, ঘৃণা, অপরাধ, সহিংসা – তিনি পরাভূত করবেন।
- সত্য বলতে সাহস ধর, ভুলে যেয়ো না যে, "অন্যের চাইতে তুমি উর্ধে নও। কেই যদি মনে করে যে, তাকে ছাড়া আর কেউ নেই যে সত্য কথা বলে, "এ কারণে অন্য মানুষের সঙ্গীত্ব বর্জন করো না"।
- জীবনের কিছু আদর্শ ধরে রাখো এবং এবং নিজের ছাড়াও মহত্তর কিছুর জন্য জীবন যাপন কর – তার জন্য যদি অনেক মূল্যও দিতে হয়"
- এমন মানুষ নেই যারা ভুল করে না। "কিন্তু এই ভুলগুলো যেন তোমার জন্য কারাগার হয়ে না যায়, তোমাকে বন্দী করে না রাখে। ঐশপুত্র এই জগতে এসেছেন "যারা সুস্থ তাদের জন্য নয়, বরং যারা অসুস্থ।" সুতরাং আবার উঠে দাঁড়াতে যেন ভয় না করে; পড়ে গেলে আবার শুরু কর, "কেননা ঈশ্বর হচ্ছেন তোমার বন্ধু"
- যদি তিক্ততা তোমাকে আঘাত করে, তখন বিশ্বাস করো যে, অন্যেরা অনেক আছে যার ভালোর জন্য নম্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন পৃথিবীর বীজ তাদের বিনম্রতার মধ্যেই রয়েছে।"
- "জীবনটাকে ধরে রাখো, ভালবাসো, বিশ্বাস করো, ঈশ্বর ভরসা. কোন সময় হতাশ হয়ো না"।

বন্ধু যিশু সংঘ – তপস্যাকালীন ধ্যানসভা, মার্চ ২০২৪ খ্রি.

সেন্ট টমাস কাথিড্রালের দুই শতাব্দী বর্ষপূতি

লক্ষীবাজার, জনসন রোড, ঢাকা

ভূমিকা:

নিমন্ত্রণের জন্য পরম শ্রদ্ধেয় সামুয়েল সুনিল মানকিন, মডারেটর এবং বিশপ অব ঢাকা ডাইয়োসিস, চার্চ অব বাংলাদেশ-কে অনেক ধন্যবাদ, সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজকের উদ্‌যাপনে প্রতি-শুভেচ্ছা, মঙ্গল-অনুগ্রহ, এবং শান্তি-আনন্দের আশিস জ্ঞাপন করছি। চার্চ অব বাংলাদেশের সাথে কাথলিক মণ্ডলীর সম্পর্ক উদ্‌যাপন করছি:

১) খ্রিস্ট-যিশুর সাথে একাত্মতা ও বাণী প্রচার: সাধু পলের কথা দিয়ে বলি: "খ্রিস্ট-যিশুর সাথে মিলিত হয়ে তোমরা যে ঐশ-অনুগ্রহে ধন্য হয়েছো, তার জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।... খ্রিস্টের সম্বন্ধে প্রচারিত সাক্ষ্য-বাণী তোমাদের কাছে তো দৃঢ় স্বীকৃতিই পেয়েছে" (১করি ১:৪,৬)। - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

২) কাথলিক মণ্ডলী ও অ্যাংলিকান মণ্ডলী একই গোড়ায় এবং কাছাকাছি অবস্থান: বিশ্বজনীন মণ্ডলীর গোড়ায়, লক্ষীবাজারে দুই মণ্ডলীর পাশাপাশি অবস্থান। অনেক বিষয়ে ও ক্ষেত্রে ধর্মনীতি, ধর্মসংস্কার, আধ্যাত্মিকতায় ও ধর্মানুশীলনে ও ঐক্য প্রচেস্টায় কাছাকাছি অবস্থান। তবে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য ও অমিল আছে। - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৩) বিশপ যিনি মণ্ডলীর পালক: অ্যাংলিকান সম্প্রদায়ের বিধিসম্মতভাবে অভিষিক্ত পালক ও পুরোহিতবর্গ। সবার বিশপ বিডি. মন্ডল; মণ্ডলী পরিচালনে দায়িত্ব; ভক্তজনগণের ভূমিকা বিষয়ে সাদৃশ্য - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৪) পারস্পরিক ঐক্যের সাক্ষ্যদান: প্রতিষ্ঠান পরিচালনা (কাশিপুর গির্জা, হোস্টেল, কল্লোল গৃহ) আধ্যাত্মিক সেবা (আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা), শিক্ষা ও উপদেশ বাণী প্রচারে (নির্জন ধ্যান-সভা পরিচালনা), অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদিতে সহযোগিতা-সহভাগিতা, সহ-দায়িত্ব, সহযোগিতা। - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৫) সকল মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যের প্রচেষ্টা সিওবি-এর সর্বাদাই ছিল; সেই প্রচেষ্টার - সিওবি-র সাথে যৌথ উদ্‌যাপন।

৬) প্রত্যাশা ও সাফল্য কামনা।

HOLY SPIRIT MAJOR SEMINARY

GLORIOUS 50 YEARS TOWARDS BUILDING THE LOCAL CHURCH

MESSAGE

How fortunate I am, to be still alive and get the favour of celebrating the Golden Jubilee of the Holy Spirit Major Seminary, the constant stream that flows to the Local Church in Bangladesh!

With joy and gratitude I write this few lines because God had blessed me by making me a part of the dreaming that was done together with others regarding this core institution of the Local Church.

Thanks to the ecclesial authority that I was sent abroad for studies in order to journey with the seminary in teaching, animating and directing from the time when it was three year old.

The focal motivation that drove me always was to build the Church in Bangladesh according to the vision, mission and direction given by the Second Vatican Council.

The raison-d'etre of the Seminary, which was and still being shared by others is: (a) seminary for formation of future priest, (b) seminary for promotion of theological thinking for one-self and for others and (c) seminary for service to the laity, religious men and women and ongoing *agiornamento* of the clergy of the Local Church, shall remain as challenges beyond years of anniversaries.

With deepest honour and respect we bow our heads to the Bishops who initiated, to those who went before and to those who still continue to walk the path. Congratulations to those who taught, were taught and still are being taught.

On the occasion of the Golden Jubilee of the Holy Spirit Major Seminary, we harvest with joy the fruits of the seed planted by others in tears. Let God bless us all and the Local Church.

Cardinal Patrick D’Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

(কাথলিক মণ্ডলীর)

পুণ্য দপ্তর

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের তপস্যাকালীন বাণী - ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

ঐশ-পরিচালনা: মরুপথ দিয়ে মুক্তি উদ্দেশ্যে যাত্রা

প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ,
ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁর বাণী সর্বদাই মুক্তির বাণী: “আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন” (যাত্রা ২০:২)। এই কথাগুলি ছিল সিনাই পর্বতে মোশির নিকট প্রদত্ত দশ-আজ্ঞার প্রথম বাণী। যারা এই বাণী শুনেছে তাদের কাছে ঈশ্বর যে-মহাযাত্রার কথা বলেছেন তা তাদের কাছে পরিচিত ছিল: দাসত্বের অভিজ্ঞতার ভারবোঝা যেন এখনও তাদের ঘারে চেপে বসে আছে। মরুভূমিতে তারা মুক্তির উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত রাস্তা স্বরূপ “দশটি বাণী” লাভ করেছে; ঈশ্বরের ভালবাসার শক্তিকে গুরত্ব দেওয়ার জন্য আমরা বাণীগুলোকে “আজ্ঞা” বলি। মুক্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান খুবই দাবিপূর্ণ। তাৎক্ষণিক ভাবে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় নি। একটি যাত্রার অংশ হিসেবে সাড়াদানটি পরিপক্ক হতে হয়েছে। মরুপ্রান্তরে যাত্রারত ইস্রায়েল জাতি যেমন মিশরের দাসত্ব আঁকড়ে ধরে ছিল, অতীতকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় পরমেশ্বর প্রভু এবং মোশীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল – আজও ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের জনগণ পেছনে-ছেড়ে-আসা নিপীড়িনমূলক দাসত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। আমরা যখন জীবনে হতাশ হয়ে পড়ি, মরুপ্রান্তরে ঘুরে মরি, গন্তব্য স্থান সেই প্রতিশ্রুত দেশের সন্ধান যখন না পাই, তখন এই অবস্থা যে কতো সত্য তা আমরাও উপলব্ধি করি। তপস্যাকাল হচ্ছে ঐশ-অনুগ্রহের কাল, যে সময়ে প্রবক্তা হোসেয়ের কথা অনুসারে, মরুভূমি প্রথম ভালবাসার একটি স্থান হয়ে উঠতে পারে (দ্রঃ হোসেয়া ২:১৬-১৭)। *দাসত্বকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাঁর জনগণকে গড়ে তুলেন,* মৃত্যু থেকে জীবনে নিস্তার লাভ করার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সক্ষম করে তুলেন। বরের মতো, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের কথা কানে কানে ব’লে তিনি আমাদেরকে আবারও নিজের কাছে টেনে নেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা কোন তাত্ত্বিক বিষয় নয়। আমাদের তপস্যাকালের সাধনা যদি বাস্তব হতে হয় তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হছে বাস্তবতার প্রতি নজর দেওয়া। জ্বলন্ত ঝোপ থেকে ঈশ্বর যখন মোশীকে ডাকলেন, তখন তিনি প্রকাশ করলেন এমন একজন হিসেবে, যিনি দেখেন এবং সর্বোপরি যিনি শ্রবণ করেন: “মিশর দেশে আমার আপন জাতির দুঃখদুর্দশা কতখানি, তা আমি দেখেছি, দেখেইছি। তাদের কর্মকর্তাদের অত্যাচারে তারা যে কেমন ক্ষোভের হাহাকার ক’রে থাকে, তাও শুনেছি আমি। হ্যাঁ, তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা আমার জানাই

আছে। তাই আমি মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি। এই দেশ থেকে তাদের নিয়ে যেতে চাই এমনই-এক দেশে, যা বিস্তীর্ণ উর্বর, এমনই-এক দেশে, যেখানে বয়ে চলে দুধ ও মধুর স্রোত" (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)। আজও কত নিপীড়িত ভাই-বোনের আর্তনাদ ঊর্ধ্বলোকে শোনা যায়। এসো আমরা প্রশ্ন করি: তাদের আর্তনাদ কি আমরা শুনতে পাই? সেই আর্তনাদ কি আমাদের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে? সেই আর্তনাদ কি আমাদের স্পর্শ করে? অনেক কিছুই

পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, আদি থেকে যে-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আমাদের একে-অন্যকে সংযুক্ত করে রাখে তা আমরা স্বীকার করি না।

আমারা যখন লাম্পেদুসা শহর পরিদর্শন করছিলাম, "উদাসীনতার বিশ্বায়ন"-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি দুটো প্রশ্ন করেছিলাম যার গুরুত্ব আজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছি: "আদম তুমি কোথায়?" (আদিপুস্তক ৩:৯) এবং "তোমার ভাই কোথায়?" তপস্যাকালে আমাদের যাত্রা বাস্তবে ফলদায়ী হয়ে উঠবে যদি উপরোক্ত প্রশ্ন দুটি আবার শ্রবণ ক'রে, আমরা যদি অনুভব করি যে, আজও আমরা রাজা ফারাও-এর রাজত্বে বাস করছি। এই রাজত্ব আমাদেরকে ক্লান্ত এবং উদাসীন করে রাখছে। এমন এক উন্নয়ন মডেলের মধ্যে আছি যা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করছে, আমাদের ভবিষ্যত লুণ্ঠিন করছে। মাটি, বায়ূ এবং জল দুষিত হচ্ছে, একই ভাবে আমাদের প্রাণও দূষিত হচ্ছে। সত্য যে দীক্ষাস্নানে আমাদের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তথাপি আমাদের অন্তরে আছে দাসত্বের প্রতি অব্যক্ত আকর্ষণ। একই ধরনের অতি অভ্যস্থ নিরাপত্তার দিকে আমাদের আকর্ষন রয়েছে, যা আমাদের মুক্তির পরিপন্থী।

যাত্রাপুস্তকের বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাটা বেশ বিস্তারিতই বলা হয়েছে: ঈশ্বর যিনি দেখছেন, তিনি সচেতন হচ্ছেন এবং তিনি মুক্তি নিয়ে আসছেন। ইস্রায়েল জাতি তা চাচ্ছে না। ফারাও রাজা তাদের স্বপ্ন প্রতিরোধ করছে ও উর্ধলোকের নিদর্শন অবজ্ঞা করছে; রাজা এমনভাবে এই জগতকে দেখছে, যেখানে মানবমর্যাদা পদদলিত হবে, খাঁটি বন্ধন অস্বীকৃত হবে, যা কোনদিন পরিবর্তিত হবে না। রাজা সবকিছুকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে। সুতরাং প্রশ্ন করি আমরা: আমরা কি নতুন জগত দেখতে চাই? পুরনোর সাথে আপোষ মিমাংসা ত্যাগ করতে প্রস্তুত? আমার অনেক ভ্রাতা-বিশপদের সাক্ষ্য এবং অনেক সংখ্যক ব্যক্তি যারা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে তারা আমাকে আরও নিশ্বিত করেছেন যে, আমাদেরকে "আশার অভাব"-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে কেননা "আশার অভাব" আমাদের সকল স্বপ্ন গলাটিপে মেরে ফেলছে এবং মানুষের নীরব আর্তনাদ ঊর্ধে উত্তোলিত হচ্ছে এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। এই "আশার অভাব" ইস্রায়েল জাতির দাসত্ব-কাতরতা থেকে ভিন্ন নয়, কেননা এই কাতরতা ইস্রায়েল জাতিকে মরুভূমিতে অচেতন করে রেখেছে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে প্রতিহত করেছে। মানবজাতির যাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, নতুবা বর্তমান অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। যখন দেখি মানবজাতি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং বিচার-বিধানে উন্নয়ন সকলের মানবমর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম, তখনও কেন মানবজাতি অসমতা ও সংঘর্ষের অন্ধকারে হাতরিয়ে চলছে!

আমাদেরকে নিয়ে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। এসো আমরা তপস্যাকালটিকে একটি মহান কাল হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমাদের নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই ঈশ্বরের কথা: "আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমিই তোমাকে মিশর দেশের বাইরে, দাসত্বের সেই বাসভূমির বাইরে নিয়ে এসেছি" (যাত্রা ২০:২)। তপস্যাকাল হচ্ছে *পরিবর্তনের সময়, মুক্তির সময়*। আমরা প্রতিবছর তপস্যাকালের প্রথম রবিবার যেমন স্মরণ করি যে, যিশু নিজে পবিত্র আত্মার দ্বারা মরুভূমিতে আনীত হয়েছিলেন মুক্তির উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। চল্লিশ দিন ধরে

মানবদেহধারী যিশু আমাদের সামনে ও আমাদের পাশে থাকবেন। ফারাও রাজার মত ঈশ্বর চান না যে, ইস্রায়েল জাতি সেই রাজার অধীনে প্রজা হয়ে থাকবে, বরং তিনি চান যেন আমরা তার পুত্র ও কন্যা হিসেবে থাকি। মরুভূমি এমনই একটি জায়গা যেখানে আমাদের স্বাধীনতা পরিপক্ক হতে পারে যাতে পূর্বের দাসত্বের দিকে ফিরে না যাওয়ার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ

করতে পারি। তপস্যাকালে ন্যায্যতা একটি নতুন মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি এবং সেই মাপকাঠির সহায়তায় এমন-এক সমাজের দিকে চলতে পারি, যে-পথে পূর্বে হাঁটা হয় নি।

এ সবের মানে হচ্ছে সংগ্রাম করতে হবে – যা যাত্রাপুস্তক এবং মরুপর্বতে যিশুর পরীক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার একান্ত প্রিয়জন" (মার্ক ১:১১) এবং "আমি ছাড়া তোমার যেন আর কোন দেবতা না থাকে" (যাত্রা ২০:৩), ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শত্রু এবং তার মিথ্যা দ্বারা প্রতিহত হল। ফারাও রাজার চাইতেও আমাদের ভয় করতে হবে সেই সমস্ত দেবতা যা আমরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছি। আমাদের অন্তরে নিহিত ঐ দেবতাদের কণ্ঠস্বরই শোনা যেতে পারে। সর্ব ক্ষমতাধর হব, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, অন্যেরা আমার কর্তৃত্বের অধীন হবে – এই সব কথা যে কতো মিথ্যা দ্বারা প্ররোচিত তা প্রত্যেকে জানে না। এই সমস্ত পথে অনেকেই চলেছে। আমরা টাকাপয়সার প্রতি, নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রকল্প, কয়েকটি ধারণা ও লক্ষের প্রতি, আমাদের পদ ও ঐতিহ্য প্রতি, এমন কি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে যেতে পারি। এই সবকিছু আমাদেরকে সামনের দিকে নেয়না, বরঞ্চ আমদেরকে অথর্ব করে রাখে। ফলে সাক্ষাতের পরিবর্তে নিয়ে আসে দ্বন্দ্ব। আবার নতুন মানবতাও রয়েছে, দীন ও বিনম্র জনগণ আছে যারা সেই মিথ্যার প্রলোভনে প্রলুব্ধ নয়। পক্ষান্তরে যারা দেবমূর্তি পূজা করে তারা মূর্তির মতোই হয়ে ওঠে, কথা বলতে পারে না, অন্ধ এবং চলতে অক্ষম (দ্রঃ সামসঙ্গীত ১১৫:৪+)। আত্মায় যারা দীন তারা উন্মুক্ত ও সদা-প্রস্তুত: নীরব মঙ্গলবোধ তাদের নিরাময় করে এবং জগতকে পরিপুষ্ট করে।

এখনই কাজ করার সময়, এবং এই তপস্যাকালে *কাজ করার অর্থ হচ্ছে নীরব হওয়া (ক্ষণিকের জন্য থাম), প্রার্থনায় নীরব হওয়া* যাতে আমরা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করতে পারি, দয়ালু সামরীয়র মতো *আঘাতে ক্ষত ভাইবোনদের সামনে* নীরবে দাঁড়াতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আর মানুষে প্রতি প্রেম একই প্রেম। অন্যকোন দেবমূর্তি না থাকার অর্থ হচ্ছে নীরবে ঈশ্বরের সামনে এবং প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো। এই কারণেই প্রার্থনা, ভিক্ষাদান ও উপবাস – এই তিনটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়, বরং একই ক্রিয়ার উন্মুক্ততা এবং আত্ম-ত্যাগ, যার মাধ্যমে আমরা সকল দেবমূর্তিকে বিতারণ করি কেননা তা আমাদের অথর্ব করে রাখে, আসক্তিকে ত্যাগ করি যা আমাদের বন্দী করে রাখে। এই ধর্মক্রিয়াত্রয়ের সাধনা আমাদের শীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হৃদয় পুনর্জীবিত করবে। ধীরে চলো, একটু থামো! তপস্যাকাল আমাদের জীবনের ধ্যানী দিকটা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করে।

ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই ভাইবোন হয়ে যাই, পরস্পরের প্রয়োজনে আমরা আরও সচেতন হই, যার ফলে তারা হুমকী ও শত্রু স্বরূপ না হয়ে আমাদের যাত্রাপথে সঙ্গী ও সহযাত্রী বলে উপলব্ধি হয়। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বপ্ন, আমাদের প্রতিশ্রুত দেশ – যে-দিকে আমরা যাত্রা করি আমাদের দাসত্ব ছেড়ে।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, যা আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে নতুন করে আবিষ্কার ও চর্চা করে যাচ্ছি, সেই সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী আমাদের বলছে: তপস্যাকাল *সমবেত সিদ্ধান্তের সময়*, সে-সিদ্ধান্ত ব্যাপক এবং ক্ষুদ্র – সে যাই-

হোক-না-কেন – তা যেন ধরাবাধা বিষয়ের বিপক্ষে হয়। এমন সিদ্ধান্ত যা ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশী-সমাজের প্রাত্যহিক জীবন পরিবর্তন করবে; সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো হচ্ছে যেমন: অর্থসম্পদ আমরা কীভাবে অর্জন করি, সৃষ্টির যত্ন আমরা কীভাবে

নিই, যারা সাধারণতঃ চোখে পড়েনা অথব যাদেরকে হেয় করে দেখা হয়, তাদেরকে আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করি। প্রতিটি খ্রিস্টান সমাজকে আহ্বান জানাই এই কাজটি করার জন্য: সমাজের সদস্যদের এমন সুযোগ দেওয়া যাতে তাদের জীবনধারা নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারে, সমাজে তাদের উপস্থিতি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে পারে এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য কি অবদান রাখবে তা নিয়ে ভাবতে পারে। ধিক আমাদেরকে যদি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সেই ধরনের হয় যা দেখে যিশু বিস্মিত হয়ে যাবে। আমাদের কাছে যিশু বলেন: "তোমরা যখন উপোস কর, তখন ভণ্ডদের মতো বিষন্ন ভাব দেখিয়ো না। তারা যে উপোস করছে, সেটা লোকদের দেখাবার জন্যেই

তো তারা মুখখানা অমন শুকনো করে রাখে" (মথি ৬:১৬)। পক্ষান্তরে অন্যেরা হাসিমুখ দেখুক, মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক এবং ভালবাসা উপলব্দি হোক যে ভালবাসা সবচাইতে ক্ষুদ্র ও কাছের মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে। আমাদের খ্রিস্টান সমাজের প্রত্যেকের জীবনে এই সবকিছু হতে পারে।

যতটুকু এই তপস্যাকাল পরিবর্তনের সময় হিসেবে বিবেচিত হবে, ততখানি বিপর্যস্ত মানবতা সৃজনশীলতার স্ফূরণ ঘটাবে, এবং নতুন আশার আলো দেখাবে। বিগত বছরে গ্রিস্মকালে, লিসবন নগরীতে, বিশ্ব-যুবাদের কাছে যে কথাটি আমি বলেছিলাম তা আবার স্মরণ করে বলতে চাই: "খোঁজ করতে থাকো, ঝুঁকি গ্রহণ করো। সাম্প্রতিক কালের এই সময়ে, আমাদের সামনে আছে অনেক ঝুঁকি; আমরা কত মানুষের বেদনার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। বাস্তবে আমরা তৃতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করছি যে-যুদ্ধ খণ্ড খণ্ড আকারে ঘটে চলছে। তদ্সত্ত্বেও অতি সাহসভরে এমন একটি জগতের স্বপ্ন চোখের সামনে রাখতে পারি, যেখানে মাত্র মৃত্যুর বিভেষিকা নয়, বরং প্রসব-বেদনাশ্রিত একটি জগত দেখতে পাই; ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, কিন্তু ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে জগতকে দেখতে পারি। এই ভাবে চিন্তা করার সাহস আমাদের হোক" (*বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বক্তব্য*, আগষ্ট ৩, ২০২৩ খ্রি.)। সেটাই হচ্ছে পরিবর্তনের সাহস যা দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষণেই জন্ম নেয়। তিনটি ঐশগুণের মধ্যে আছে বিশ্বাস, ভালবাসা আর আশা; বিশ্বাস ও ভালবাসা ছোট্ট বোন "আশা"কে হাত ধরে নিয়ে চলে, আশাকে পথ চলতে শেখায় এবং একই সময়ে আশা তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়।

তোমাদের তপস্যাকালীন যাত্রায় আমি তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করি।

রোম নগরী, সাধু জন লাতেরান মহামন্দির, ডিসেম্বর ৩, ২০২৩ খ্রি. আগমনকালের প্রথম রবিবার।

পোপ ফ্রান্সিস

৩৮তম বিশ্ব যুবদিবস উপলক্ষ্যে
পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের বাণী

“আশায় অনন্দিত হও”
(রোমীয় ১২:১২)

যুবা প্রীতিভাজনেরা

বিগত আগস্ট মাসে বিশ্ব যুবদিবস উপলক্ষ্যে লিসবনে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনে তোমাদের সমবয়সী কয়েক লক্ষাধিক যুবক-যুবতীদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। করোনা মহামারীর সময়ে এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও আমরা আশা করেছিলাম যে, এই মাহেন্দ্রক্ষণে যুবক-যুবতীদের নিয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে একত্রিত হতে পারব। আমিসহ অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের সকলের আশা পূর্ণ হয়েছে, যা ছিল আমাদের প্রত্যাশার অতীত।। লিসবনে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনটি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়, নবীকরণের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা এবং আলো ও আনন্দের এক মহান বিস্ফোরণ।

যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর “ঐশপ্রসাদপূর্ণ চত্ত্বরে” আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, পরবর্তী বিশ্ব যুবদিবস ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল শহরে। প্রথমে আমি অবশ্য ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে রোমের পুণ্য-নগরীতে যুবাদের জুবিলী উদযাপন করতে তোমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছি, যেখানে তোমরা হবে “প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী”। যুবক-যুবতী হিসেবে তোমরাই প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীর আনন্দপূর্ণ আশা ও মানবতার চলমান পথিক। আমি তোমাদের হাত ধরে আশার পথে একসঙ্গে চলতে চাই। আমি তোমাদের ও মানব পরিবারের সকল ভাইবোনদের সাথে আনন্দ ও আশা, দুঃখ ও বেদনার কথা বলতে চাই (cf. Gaudium et Spes, 1)। এই দুই বছরে জুবিলীর প্রস্তুতিস্বরূপ আমরা প্রথম বছরে ধ্যান করব সাধু পলের উক্তি: “আশায় আনন্দিত হও” (রোমীয় ১২:১২) এবং পরবর্তী বছরে আমরা ধ্যান করব প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী: “যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পথচলায় ক্লান্ত হবে না” (ইসাইয়া ৪০:৩১)।

এই আনন্দের উৎস কোথায়?

যখন রোমের খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ নির্যাতিত হচ্ছিল সেই সময়ে “আশায় আনন্দিত হও” –– এটাই ছিল সাধু পলের অনুপ্রেরণার বাণী। খ্রিস্টের পাস্কারহস্য এবং পুনরুত্থানের শক্তির ফল স্বরূপ “আশায় আনন্দ” বাণীটি প্রেরিতদূত পল ঘোষণা করেছিলেন। এই কথা আমাদের মানবিক প্রচেষ্টা, আমাদের পরিকল্পনা বা দক্ষতার ফল নয়; বরং খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাতে প্রাপ্ত শক্তির ফল। খ্রিস্টীয় আনন্দ স্বয়ং ঈশ্বর থেকে আসে; তিনি যে আমাদের ভালবাসেন তার উপলব্ধি থেকে আসে।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত যুবদিবসের অভিজ্ঞতার পর পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট প্রশ্ন করেছিলেন: “এই আনন্দের উৎস কোথায়? কীভাবে তার ব্যাখ্যা করা যায়? এখানে অবশ্যই অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। কিন্তু সবচাইতে বড়ো নিশ্চিত ভিত্তি হচ্ছে আমার বিশ্বাস যার ফলে বলতে পারি: ঈশ্বর আমাকে চান, ইতিহাসে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাকে ভালবেসেছেন।” পোপ ষোড়ষ বেনেডিক্ট তাঁর বাণীতে আরও বলেন: “সর্বোপরি এই বোধ থাকা যে, ঈশ্বর আমাকে নিঃশর্ত ভাবে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর যদি আমাকে গ্রহণ করেন এবং এ সম্বন্ধে আমি যদি বিশ্বাস করি, তা হলে আমি নিশ্চিত জানি যে, আমার জীবনের

অস্তিত্ব একটি শুভ বিষয়, কঠিন মুহূর্তেও মানুষ হওয়া একটি কল্যাণকর বিষয়। বিশ্বাস একজনকে আন্তর-গভীরে সুখী করে।" (Address to the Roman Curia, 22 December 2011)

আমার আশা কোথায়?

যুব-বয়স হচ্ছে বহু আশা ও স্বপ্নের সময়। ঐশসৃষ্টির প্রভা, বন্ধু-পরিজন ও পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক, চিত্রকলা ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আমাদের পরিচিতি, শান্তি, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রচেষ্টা এবং আরও অনেক সুন্দর বিষয় দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলি। তবে আমরা এমন একটি কালে জীবন যাপন করছি যখন যুবক-যুবতিসহ বহু মানুষের জীবনে যেন কোনো আশা নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের সমসাময়িক কালে অনেকেই যুদ্ধ, সহিংস সংঘর্ষ, নৃশংসতা, হুমকিসহ নানা ভয়-ভীতি ও কঠিন অবস্থার শিকার হচ্ছে; তারা হতাশাগ্রস্ত, ভীত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তারা নিজেদেরকে অন্ধ-কারাগারে বন্দী বলে অনুভব করে যেখানে সত্যের সূর্য প্রবেশ করতে পারে না। এই অবস্থার নাটকীয় চিত্র হচ্ছে যুবাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা। এমতাবস্থায় সাধু পলের প্রচারিত আনন্দ ও আশা কীভাবে পেতে পারি? এখানে বড়ো একটা ঝুঁকি হচ্ছে আমরা সবাই হতাশার শিকার হয়ে যাব এই ভাবনায় যে, ভাল কাজ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ তা কারো কাছে পছন্দও হবে না আর সমর্থনও পাওয়া যাবে না। আমরা প্রবক্তা যোবের সাথে এক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি: "তবে আমার আশা কোথায়? কে আমার আশা দেখতে পারে?" (যোবঃ ১৭:১৫)

আমরা যখন মানুষের শোকাত্মক ঘটনা দেখি, বিশেষ করে যখন নির্দোষ মানুষের কষ্টযন্ত্রণা দেখি, তখন আমরা সামগীতিকারের কথা প্রতিধ্বনিত করে প্রভুকে বলতে পারি: "কেন?" একই সময়ে, আমরাও অবশ্য ঈশ্বরের উত্তর আমার নিজের করে নিতে পারি। আমরা যেহেতু ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, সেহেতু আমরাও তাঁর ভালবাসার নিদর্শন হতে পারি, যা আমাদের হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় জাগিয়ে তোলে আনন্দ ও আশা। আমি স্মরণ করছি *"লাইফ ইজ বিউটিফুল" বা "জীবন তো সুন্দর"* চলচিত্রটি যেখানে একজন যুব-বয়সী পিতা, অনেক সংবেদনশীলতা ও সৃজনশীলতার সাথে, কঠিন বাস্তবতাকে খুবই একটা দুঃসাহিকতাপূর্ণ এবং ক্রিড়ামোদি বিষয়ে রূপান্তরিত করতে পারে। বন্দী-শিবিরের বিভৎসতা থেকে রক্ষা ক'রে, তার নির্দোষিতা এবং মানুষকে অপকার করার ইচ্ছা থেকে রক্ষা ক'রে, এই বাবা তার ছেলেকে "আশার দৃষ্টিতে" সবকিছু দেখতে সক্ষম করে তুলছে। এই ধরনের গল্প শুধু কল্প কাহিনী নয়! কতো সন্তজনের জীবনে মন্দতার বিভৎস ঘটনা ঘটেছে যারা আশার দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি: সাধু সেক্সিমিলিয়ান মেরী কোলবে, সাধু যোসেফিন বাখিতা, ধন্য যোসেফ ও উইক্তোরিয়া উলমা এবং তাদের সাত সন্তানের নাম।

সাধু ষষ্ঠ পল সুস্পষ্টভাবে কর্ণনা করে গেছেন কিভাবে মানুষের মাঝে আশা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণায় উজ্জীবিত করা যায়: "একজন খ্রিস্টভক্ত বা খ্রিস্টীয় সংগঠনদল, তাদের সমাজের মধ্যে, অকল্পনীয় ও পূর্বে দেখা যায়নি এমন আশা সহজ-সরল ভাবে ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের বিশ্বাসের আলো বিচ্ছুরিত করতে পারে।" (Evangelii Nuntiandi, 21)

আশা, সেই "ক্ষুদ্র" গুণটি

ফরাসী লেখক চার্লস পেগী "আশা"কে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন; এই কবিতার শুরুতে তিনি তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলোর বিষয়ে বলেছেন- বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা- এরা তিন বোনের মতো এবং তারা একসঙ্গে পথ চলে:

"আশা ছোট বোন, তার বড় দুই দিদির পাশে থেকে পথে হাঁটে, বলতে গেলে অগোচরে।

তথাপি, সেই ছোট্ট জনই সবকিছুকে কাছে টেনে আনে।
কেননা বিশ্বাস শুধু তাই দেখে যার অস্তিত্ব আছে।
ভালবাসা তাকেই ভালবাসে যার অস্তিত্ব আছে।
কিন্তু আশা ভালবাসে সেই সবকিছু যা ভবিষ্যতে আসবে।

আশাই অন্যদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়;
আশা অন্যদেরকে সামনে দিকে নিয়ে যায়;
আর সবাইকে একত্রে পথ চলতে সাহায্য করে"।

(দ্বিতীয় গুণের রহস্যের দ্বারমণ্ডপ)
আমি নিজেও একমত যে, আশা হলো নম্র, ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি আবশ্যকীয়। একটু চিন্তা করো তো – আশা ছাড়া আমরা কি করে বেঁচে থাকতে পারি? আশা ব্যতীত আমাদের দিনগুলো কেমন হবে? আশা হলো আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে লবণ স্বরূপ।

আশা, অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত আলো স্বরূপ

খ্রিস্টিয় ঐতিহ্য অনুসারে নিস্তার দিবসত্রয়ের মধ্যে পুণ্য শণিবার হলো আশার দিবস। পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থানের মধ্যস্থিত এই দিনটি যেন শিষ্যদের হতাশা এবং পুনরুত্থানের ভোরের আনন্দের মধ্যকার একটি নির্জন স্থান। এই স্থানেই আশা জন্ম নেয়। পুণ্য শনিবারে, মণ্ডলী স্মরণ করে যে, খ্রিস্ট নীরবে পাতালে অবরোহন করেন। আমরা অনেক আইকন চিত্রে এই দৃশ্য দেখতে পাই যে, আলোকসজ্জিত আমাদের প্রভু যিশু গভীরতর অন্ধকারে নেমে যান এবং সেইসব অতিক্রম করে যান। ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের মৃত্যু-অভিজ্ঞতার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, অথবা দূর থেকে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসেন, এমনটা নয়; আমাদের নরক-যন্ত্রণাময় মুহূর্তগুলোর মধ্যে তিনি আলো হয়ে প্রবেশ করেন, যার ফলে অন্ধকারে আলো উদ্ভাসিত হয় এবং অন্ধকার পরাভূত হয় (দ্রঃ যোহন ১:৫)। দক্ষিণ আফ্রিকার জোসা ভাষার একটি কবিতায় এই বিষয়টা চকৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: "আশা যদি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবুও আমি এই কবিতার মধ্য দিয়ে আশা জাগিয়ে তুলব। আমার আশা পুনঃসঞ্জীবিত কেননা আমি প্রভুতে আশা রাখি। আমি আশা করি একদিন আমরা এক হব! আশায় স্থির থাকো কেননা তার শুভফল সন্নিকট"।

যদি আমরা চিন্তা করি, কুমারী মারীয়ার আশাটাও ছিল ঠিক তাই; তিনি যিশুর ক্রুশের নীচে স্থির থেকেছিলেন কেননা তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, "ভাল ফল" শীঘ্রই আসন্ন। মারীয়া একজন আশাবাদী নারী, তিনি আশার জননী। কালভেরীতে, "সকল দুরাশার মাঝে আশা" (দ্রঃ রোমীয় ৪:১৮), তাঁর পুত্রের দ্বারা প্রচারিত পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা থেকে তিনি কখনো সরে যাননি। আমাদের জননী মারীয়া পুণ্য শনিবারের নীরবতাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ভালবাসা ও আশাপূর্ণ বাসনা দিয়ে, আর তিনি শিষ্যদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা জাগিয়ে তুলেছিলেন যে, যীশু মৃত্যুকে জয় করবেন আর মন্দতা কোন সময়ই শেষ কথা হয়ে থাকবে না।

খ্রিস্টীয় আশা কোন সহজলব্ধ আশাবাদ নয়, বিশ্বাসপ্রবন কোন ধূয়ো নয়: এটা হলো নিশ্চয়তা, ভালবাসা ও বিশ্বাসে প্রোথিত সে, ঈশ্বর আমাদেরকে কখনো ত্যাগ করেন না এবং তিনি তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত থাকেন: "ছায়াছন্ন গিরিসঙ্কট যদি পেরিয়ে যাই আমি, তবুও কোন অমঙ্গল ভয় করি না, কারণ তুমি যে আমার সঙ্গেই আছ" (সাম ২৩:৪)। খ্রিস্টীয় আশা কোন সময় দুঃখ-দুর্দশা ও মৃত্যুকে অস্বীকার করে না; এটা হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ভালবাসার উদ্‌যাপন, যিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন, এমনকি তখনও যখন মনে হয় তিনি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে আছেন। "খ্রিস্ট নিজেই হলেন আমাদের আশার আলো এবং অন্ধকারের পথ প্রদর্শক, কেননা তিনিই হলেন "উজ্জল প্রভাত তারা" (খ্রিস্ট জীবিত, ৩৩)।

আশা প্রতিপালন করা

আমাদের মধ্যে আশার বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার পর এমন সময় আসতে পারে যখন দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি আর দৈনন্দিন জীবনের চাপ আশার আলো নিভে যাবার ঝুঁকির সম্মুখীণ হয়। অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন যাতে বড়ো অগ্নিকুন্ডে পরিণত হতে পারে। ঠিক সেইরূপ পবিত্র আত্মার প্রশান্ত প্রাণবায়ূ আমাদের আশা লালন করে আর আমরা নানা ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি।

প্রার্থনার দ্বারা আশার পরিচর্যা হয়। প্রার্থনা আমাদের আশা সংরক্ষণ ও নবায়ন করে। প্রার্থনা আশার স্ফুলিঙ্গকে পাখার বাতাসে অগ্নিশিখায় পরিণত করে। "আশার প্রথম শক্তি হলো প্রার্থনা। প্রার্থনা করো আর আশা বৃদ্ধি পেয়ে সামনে অগ্রসর হয়"। (ধর্মশিক্ষা, ২০ মে ২০২০ খ্রি.)। প্রার্থনা হলো পাহাড়-চূড়ায় আরোহন করার মতো একটা বিষয়: নিচের জমি থেকে তাকালে সূর্যকে মেঘ-ঢাকা অবস্থায় দেখা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যখন পাহাড়ের উপরে উঠে যাই, তখন সূর্যের আলো ও উষ্ণতা আমাদেরকে আবৃত করে। আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য সর্বদাই সেখানে ছিল, এমনকি যখন আমাদের চারপাশের সবকিছুকে অন্ধকার ও ছায়ছন্ন বলে মনে হয়।

প্রিয় যুব বন্ধুগণ, যখন তোমাদের মনে হয় যে, ভয়, সন্দেহ, দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আর তোমরা আর সূর্য দেখতে পারছ না, তখন তোমরা প্রার্থনার পথ বেছে নাও। কেননা, "যখন কেউই আমার কথা আর শোনে না, ঈশ্বর তখনও আমার কথা শোনেন" (ষোড়শ বেনেডিক্ট , স্পে সালভি ৩২)। আসুন আমরা প্রতিদিন কিছু সময় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি, বিশেষভাবে যখন আমদের মনে হয় সমস্যা-সঙ্কটে আমরা ডুবে যাচ্ছি তখন "নীরবে আমার অন্তর থাকে পরমেশ্বরের আশায়, কারণ তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার আশা" (সামসঙ্গীত ৬২:৫)।

আশা আমাদের নিত্যদিনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে লালিত হয়। সাধু পলের নির্দেশ – "আশায় আনন্দিত হও" (রামীয় ১২:১২) আমাদের প্রতিনিদনকার জীবনে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান জানায়। আমি তোমাদেরকে এমন একটি জীবন-স্টাইল বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করছি যার ভিত্তিমূল হবে আশা। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্য দিয়ে নেতিবাচক চিন্তা শেয়ার করা খুবই সহজে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের জন্য আমার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ হলো: প্রতিদিন কমপক্ষে একটি আশার বাণী অন্যদের সাথে শেয়ার করতে চেষ্টা করো। তোমার বন্ধু-বান্ধব এবং তোমার চারপাশের লোকদের কাছে আশার বীজ বপন করো। কেননা "আশা নম্র, এটি এমন একটি গুণ যা প্রতি দিন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। প্রতিদিন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা পবিত্র আত্মার প্রথম ফসল, পবিত্র আত্মা নিজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্য দিয়ে কাজ করেন।" (Morning Meditation, 29 October 2019).

আশার মশাল জালাও

কোন কোন সময়, যখন তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রে বাইরে যাও, তখন তোমরা তোমাদের স্মার্ট ফোন সঙ্গে নিয়ে যাও এবং সেটাকে লাইট হিসেবে ব্যবহার কর। বড় বড় কনর্সাটে তোমরা হাজার হাজার মানুষ সঙ্গীতের তালে তালে এই আধুনিক মোমবাতিগুলো নাড়াতে থাকো; তখন বিরাট একটা মনমুগ্ধকর আলোর প্রদর্শনী হয়ে ওঠে। রাতের বেলা আলো সবকিছুকে নতুন ভাবে দেখতে আমাদের সাহায্য করে এবং অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। খ্রিস্টযিশুর আশার আলোতেও ঠিক তা-ই ঘটে। যীশুর কাছ থেকে, তাঁর পুনরুত্থান থেকে আমাদের জীবন আলোর মতো হয়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গে, আমরা সবকিছু দেখি একটা নতুন আলোতে।

আমরা শুনেছি যে, যখন লোকেরা সাধু দ্বিতীয় জন পলের কাছে কোন একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আসতো তখন তিনি যে প্রশ্নটি প্রথম করতেন তা হলো: "বিশ্বাসের দৃষ্টিতে আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?" যখন আমরা কোনকিছুকে আশার আলোতে দেখি, তখন তা ভিন্নরূপ ধারণ করে। সেজন্য আমি তোমাদের উৎসাহিত করছি

যেন তোমরা এভাবে বিষয়গুলোকে দেখতে শুরু করো। পরমেশ্বরের এই আশার দান দ্বারাই খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নতুন আনন্দে পূর্ণ হয় এবং তা তাদের আপন অন্তর থেকে উৎসারিত হয় । চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা সব সময়েই থাকবে, কিন্তু যদি আমাদের থাকে আশায় "পূর্ণ বিশ্বাস", তখন আমরা সবকিছুর মোকাবেলা করতে পারি এই জেনে যে, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা শেষ কথা নয়। আর আমরা নিজেরাও অন্যের জন্য আশার এক আলোক-সংকেত হয়ে উঠতে পারি।

তোমরা প্রত্যেকেই আশার আলোক-সংকেত হতে পারো সেই পরিমাণে যে-পরিমাণে তোমার বিশ্বাস সুনির্দিষ্ট হয়, বাস্তবতায় প্রোথিত হয় এবং আমাদের ভাইবোনদের প্রয়োজনের প্রতি তোমরা সংবেদনশীল হতে পারো। এসো আমরা যীশুর সেই শিষ্যদের কথা স্মরণ করি যারা একদিন একটি উচু পর্বতে তাঁকে মহিমার আলোতে রূপান্তরিত হতে দেখেছিল। যদি তারা সেখানেই থাকতো তাহলে তাদের জন্য সেটা খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হতো, কিন্তু অন্যেরা যে তার সহভাগী হতে পারতো না। তাদেরকে পর্বত থেকে নেমে আসতে হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। জগত থেকে পালিয়ে বেড়ানো আমাদের উচিত হবে না বরং ঈশ্বর আমাকে যে সময়ে রেখেছেন সেই সময়কে ভালবাসতে হবে, আর এটা বিনা কারণে নয়। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদের যে অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছেন তা ভাইবোনদের সঙ্গে সহভাগিতার মধ্য দিয়েই আমরা কেবলমাত্র আনন্দ খুঁজে পেতে পারি।

প্রিয় যুবক-যুবতীগণ, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আশা ও আনন্দ অপরের সঙ্গে সহভাগিতা করতে কখনো ভয় পেয়ো না! তোমার অন্তরে যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে তা লালন কর, আবার একই সময়ে তা সহভাগিতাও কর। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে, অন্যকে দেওয়ার মধ্য দিয়েই তা বৃদ্ধি পাবে! নিজস্ব একটি ভালো অভিজ্ঞতা জ্ঞান করে খ্রিস্টীয় আশা আমাদের নিজেদের মধ্যে রেখে দিতে পারি না, কারণ এটা সকলেরই প্রাপ্য। তুমি বিশেষভাবে তোমার সেই বন্ধুদের খুব কাছে থাকো যারা হয়তো বাহ্যিকভাবে হাসতে দেখছো, কিন্তু আশার অভাবে ভেতরে ভেতরে তারা কাঁদছে। উদাসীনতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দ্বারা তোমরা নিজেদেরকে আক্রান্ত হতে দিও না। নদী-খালের মতো উন্মুক্ত থাকো যেখানে যিশুর আশা প্রবাহিত হতে পারে আর তুমি যেখানে বাস কর সেখানে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

"খ্রিস্ট জীবিত! তিনি আমাদের আশা, এবং তিনি বিস্ময়কর ভাবে যুবাদের আমাদের জগতে নিয়ে আসেন!" (খ্রিস্ট জীবন্ত ১)। আমি প্রায় পাঁচ বছর আগে তোমাদের কাছে এই কথা বলেছিলাম যখন যুবা-বিষয়ক সিনড সমাপ্ত হল। আমি তোমাদের সকলকে, বিশেষভাবে যারা যুব-সেবা কার্যক্রমে জড়িত আছ, তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চাই যেন তোমরা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত দলিল, *"খ্রিস্ট জীবিত"* শীর্ষক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রটি পুনরায় পাঠ করার জন্য। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং আশায় জাগ্রত হয়ে, সেই অবিস্মরণীয় সিনডের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করার সময় এখন এসে গেছে। এসো আমরা আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে আশার জননী মারীয়ার কাছে নিবেদন করি। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন কি করে আমরা প্রভু যিশু, যিনি আমাদের আশা ও আনন্দ, তাঁকে আমাদের হৃদয়ে বহন করতে পারি এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁকে শেয়ার করতে পারি।

প্রিয় বন্ধুগণ, তোদের জীবন পথে যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তোমরা আনন্দিত হয়। তোমরা উপভোগ করো এই প্রত্যাশা করি! আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি ও আমার প্রার্থনায় আমি তোমাদের সাথে যাত্রা করছি। আর আমি তোমাদের কাছে চাই যেন তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর।

রোম নগরী, সাধু যোহন লাতেরান মহামন্দির, ৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি., লাতেরান মহামন্দিরের পার্বণ দিবস।

পোপ ফ্রান্সিস

অনুবাদক:
ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি
নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী

৩২তম বিশ্ব রোগী দিবস : সুস্থতার জন্য অসুস্থ সম্পর্ককে সুস্থ করা।

প্রতিবছর ১১ই ফেব্রুয়ারি, লুর্দের রাণী কুমারী মারীয়ার পর্ব দিবসে পুণ্যপিতা পোপের নির্দেশে বিশ্বরোগী দিবস পালিত হচ্ছে।

এবছর বছর, ৩২তম রোগী দিবেসের জন্য পোপ ফ্রান্সিস যে বাণী রেখেছেন তা হল: "মানুষের একা থাকা ভাল নয় – সুস্থ করতে হলে অসুস্থ সম্পর্ককে সুস্থ করতে হবে"।

এই কথার মধ্য দিয়ে পোপ মহোদয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। সুস্থতার জন্য অপরের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নিরাময় করতে হয়।

আদিপুস্তকে বর্ণিত আদমের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আদম সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রথম চিন্তা ছিল এই যে, সে যেন অন্য সবার সাথে মিলন ও সম্পর্কে বাস করে। আমরা সৃষ্ট হয়েছি একত্রে বাস করার জন্য – একা একা বাস করার জন্য নয়। মানুষের দুর্বল অবস্থায়, অসুস্থতার সময় এবং নিরাপত্তার অভাবের সময় এই সম্পর্কময় মানবতা একান্ত প্রয়োজন; সম্পর্কের অভাব অনেক সময় অনেক বড়ো বড়ো অসুস্থতায় কারণ হয়ে যায়।

অসুস্থতার কারণে ও বার্ধক্যের কারণে কতো মানুষ আছে যারা জীবনে একাকীত্ব অনুভব করে, এমন কি নিজেকে নিগৃহীত বলে অনুভব করে এবং স্বাস্থ্যসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে মরন করে। অতএব স্বাস্থ্যসেবাকে হতে হবে "নিরাময়কারী মিত্রসম্পর্ক" মূলক -- যা চিকিৎসক, রোগী এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরাজ করবে।

"মানুষের একা থাকা ভাল নয়" – এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, "মানুষের পাপ ঈশ্বরের সাথে, নিজেদেরে সাথে, অপরের সাথে এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং মানবসমাজের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যহত করে।"

অতএব পোপ মহোদয় সবাইকে আহ্বান করেন যেন দয়ালু সামরীয়র মতো তারা প্রত্যেকে রোগীদের প্রতি সহমর্মী হয়ে প্রেমপূর্ণ সান্নিধ্য দান করে।

রোগীদের সেবা করার অর্থ হচ্ছে সম্পর্কের যত্ন নেওয়া; সেই সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে, পরিবার, বন্ধু ও স্বাস্থ্য-সেবাকর্মীদের সঙ্গে,

সৃষ্টি এবং নিজেদের সঙ্গে। একাকীত্বের ক্ষত সম্পর্ক দিয়ে নিরাময় করতে হবে।

যারা অসুস্থ তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে শত ব্যস্ততার সত্ত্বেও তাদের কাছে আমাদের ভালবাসা ও সান্নিধ্য দান করা।

পোপ মহোদয় বলেন, "তোমরা যারা রোগী, অন্যের সাহচর্য ও যত্ন বাসনা করতে লজ্জা পেয়োনা। তোমার অনুভূতি তুমি গোপন রেখোনা। ভেবো না যে, তোমরা অন্যের ওপর ভার-বোঝা হয়ে আছ।"

যারা অসুস্থ, দুর্বল, এবং দরিদ্র তারা মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র। আমাদের মানবিক যত্ন ও পালকীয় মনোযোগের মধ্যেও তারা প্রাণ হয়ে থাকবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

১০ই জানুয়ারি, ২০২৪

স্থানীয় মণ্ডলীর উন্নয়নে নটর ডেম কলেজের অবদান

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

নটর ডেম কলেজের পচাত্তর বছরের পূর্তি একটি শুভ মুহূর্ত। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির হীরক জয়ন্তী উৎসব একটি মিলন-মোহনা – একদিকে মানুষের মিলন-মোহনা আবার অন্য দিকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত – এই ত্রিকালের মিলন-মোহনা। এই মিলন-মোহনায় দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখছি তার আদি ও গোড়াপত্তন, বর্তমানকে লক্ষ্য ক'রে দেখছি তার কীর্তি ও অবদান এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জাগ্রত হচ্ছে নতুন স্বপ্ন ও অঙ্গীকার। এখানেই তো জয়ন্তী উৎসবের সার্থকতা।

নটর ডেম কলেজের গোড়ার কথা

নটর ডেম কলেজ কাথলিক চার্চ-এর (মণ্ডলীর) একটি প্রতিষ্ঠান। আদিটা কিন্তু স্থানীয় নয় বরং বিশ্বজনীন। প্রায় সোয়া দুই সহস্রাব্দ পূর্বে প্রভু যিশু এই পৃথিবী থেকে স্বর্গধামে চলে যাবার আগে তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছিলেন এই বলে: *"যাও, সমস্ত জাতির মানুষের কাছে যাও, তাদের শিক্ষা দাও"*। যিশুর শিষ্যেরা যুগের পরিক্রমায় ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুরে যিশুর সেই অমৃতবাণী নিয়ে। তারও পনেরোটি শতক পর সমুদ্রপথে যাত্রা ক'রে যিশুর শিষ্যদের উত্তরাধীকারী মিশনারিরা বঙ্গভূমিতে এসে পৌঁছলো। বিদেশ থেকে মিশনারিরা যখন ও যেখানেই গেছেন প্রথমেই তারা মানুষকে শিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে গেছেন। একই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক চার্চের একটি মিশনারি ধর্মসংঘ – "হলি ক্রস সংঘ" হিসেবে যারা পরিচিত – তারা বঙ্গভূমিতে আগমন করেন। তারা পুরনো ঢাকা শহরে লক্ষীবাজারে অবস্থান করে শিক্ষাসেবার কাজ শুরু করেন।

সেন্ট গ্রেগরি নামে শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে, পর্যায়ক্রমে প্রাইমারী, জুনিয়র এবং হাইস্কুল হিসেবে সুদীর্ঘ বছর ধরে অবস্থান ক'রে পরিশেষে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এক পর্যায়ে "সেন্ট গ্রেগরি কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট গ্রেগরি কলেজের নাম পরিবর্তন করে মতিঝিল এলাকার নতুন ক্যাম্পাসে "নটর ডেম কলেজ" নামে নতুন পরিচয় লাভ করে। গ্রেগরি কলেজের প্রতিষ্ঠা বছর থেকে গণনা করে বর্তমানে নটর ডেম কলেজটি তার হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। কলেজের নাম পরিবর্তনের পেছনে যে কারণটি ছিল তা হল গ্রেগরি

কলেজের প্রাথমিক অবস্থায় যে সমস্ত আমেরিকান হলি ক্রস মিশনারি ফাদারগণ বাংলাদেশে এসে কলেজে কাজ ও অধ্যাপনা করতেন তারা প্রায় সবাই যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত প্রখ্যাত নটর ডেম ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করেছেন এবং সেখান থেকে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে বাংলাদেশে এসেছেন। হলি ক্রস ইন্ডিয়ানা ফাদার-প্রোভিন্স-এর অধীনস্ত নটর ডেম ইউনিভার্সিটির সহায়তায়, জনবল ও অর্থবল দিয়ে ঢাকার নটর ডেম কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই সব কারণেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম "নটর ডেম কলেজ" রাখা হয়।

"হলি ক্রস সংঘ" বিশ্বজনীন কাথলিক চার্চ বা মণ্ডলীর একটি ধর্মসংঘ। ধর্মসংঘের কাজ কাথলিক চার্চের মিশন সম্পন্ন করা, আবার কাথলিক চার্চের মিশনও সম্পাদিত হয়ে থাকে ধর্মসংঘের উদ্যোগ, আদর্শ, বিশেষত্ব অনুযায়ী সেবাকর্মের মাধ্যমে। অতএব চার্চ এবং হলিক্রস ধর্মসংঘ, বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীতে পরস্পর সম্পূরকতার ভাব নিয়ে সেবাকাজ সম্পন্ন করে থাকে। এই কথা অনুসরণে বলা যায় যে, নটর ডেম কলেজটি বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের আওতাভুক্ত হলি ক্রস ধর্মসংঘ দ্বারা পরিচালিত। নটর ডেম কলেজ যে-ভূমিকা ও অবদান দেশব্যাপী বৃহত্তর সমাজে এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে রেখে যাছে তা স্থানীয় মণ্ডলী ও হলি ক্রস সংঘ – শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়েরই অবদান।

বিগত পচাত্তর বছর ধরে চার্চের মিশন-দায়িত্বের অংশীদার হিসেবে নটর ডেম কলেজ দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমধর্মী ও অতূলনীয় সেবা ও বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে। আশা করি এ বিষয়ে পৃথকভাবে বহুজনের আলোচনা স্মরণিকায় স্থান পাবে। বাংলাদেশে চার্চের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই কাথলিক চার্চ, দেশ ও জাতি নির্মাণের জন্য, প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, যার মধ্যে নটর ডেম কলেজ অন্যতম। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র দুবছরের মাথায় সেন্ট গ্রেগরি কলেজ (নটর ডেম কলেজের প্রথম নাম) স্থাপন করা হয়; তারই পচাত্তর বছরের পূর্তি বা হীরক জয়ন্তী পালন করছি। ঠিক একই ভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই দেশ ও জাতি নির্মাণের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সাথে কাথলিক চার্চেরও অনেক প্রতিষ্ঠান সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপন করছে। এই ধারাটা একটা তাৎপর্য বহন করে: জনগণের আশু চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানের জন্য এবং তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থাকে।

নটর ডেম কলেজের অবদান

হলি ক্রস সংঘ-সহ স্থানীয় মণ্ডলী বা চার্চের জন্য, শিক্ষাক্ষেত্রে নটর ডেম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানসমূহ চিহ্নিত করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন:

১) নটর ডেম কলেজ বিগত দশকগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী, ব্যতিক্রমধর্মী, আদর্শিক, মূলবোধসম্পন্ন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা দান করেছে, সুনামধারী ও সুখ্যাতিপুর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত বছরগুলোতে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে; নটর ডেম কলেজ একটি অনুকরণীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ ও সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২) নটর ডেম কলেজের লক্ষ্য মানুষ গড়া, আলোকিত মানুষ গঠন করা; পরীক্ষায় পাশ করা বা ভাল ফল পাওয়া প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

৩) শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি, মানবিক ভ্রাতৃত্বে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে নটর ডেম কলেজ অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চর্চা, দেহ-মন-আত্মার সমন্বিত বিকাশ সাধন, সৃষ্টি ও পরিবেশের প্রতি এবং দরিদ্র ও বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি যত্ন ও ভালববাসা, প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যকে সর্বজনীন করে নটর ডেম কলেজ পরিচালিত হচ্ছে।

৪) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেনি নির্বিশেষে সকলের জন্য নটর ডেম কলেজ উন্মুক্ত। তবে যিশুর শিক্ষা অনুসারে নটর ডেম কলেজ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এর ফলে গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীরা, দরিদ্র ছেলেরা এবং আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ছেলেরা পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে

সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই নীতি আছে বলে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রান্তিক ছেলেরা ভাল শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং অন্যদের সাথে সমান কাতারে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। নটর ডেম কলেজটি যেন সবাইকে নিয়ে: বাঙালি ও আদিবাসী/ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির ছেলেরা, বিভিন্ন ধর্মের ছেলেদের নিয়ে একটি পরিবার ও মিলন সমাজ হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে।

৫) বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা খুবই নগন্য, ক্ষুদ্র যেমন জনগোষ্ঠি, সম্ভাবনা তেমনি সীমিত। তথাপি শিক্ষা ক্ষেত্রে, নটর ডেম কলেজের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজে খ্রিস্টমণ্ডলীর ধারণা, আদর্শ, তার উপস্থিতি ও শুভ প্রভাব খুবই পরিচিত ও ব্যাপক। স্থানীয় মণ্ডলী এই অবদানের জন্য নটর ডেম কলেজের নিকট কৃতজ্ঞ।

৬) কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মণ্ডলীর যাজক-প্রার্থী এবং সন্নাসব্রতী যাজক ও ব্রাদারগণ নটর ডেম কলেজের মতো শ্রেষ্ঠ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার সুযোগে পেয়েছে। নটর ডেম কলেজে বি.এ. ডিগ্রী কোর্স অব্যাহত রাখা হয় প্রধানত ভাবী যাজক প্রার্থীদের পড়াশুনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। দেশের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে আসা সেমিনারিয়ানগণ, বিভিন্ন সেমিনারিতে বাস করে নটর ডেম কলেজে বি.এ. পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছে কেননা তাদের জন্য বি.এ. ডিগ্রী লাভ করা পরিবর্তী ধাপের জন্য বাধ্যতামূলক। বি.এ. ডিগ্রী চলমান রাখার জন্য এবং তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার জন্য নটর ডেম কলেজকে অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। তথাপি যে-মণ্ডলী সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ দিতে চায় সেই মণ্ডলীর সেবাকর্মী যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীরা যদি ভাল শিক্ষা ও গঠন না পায় তাহলে স্থানীয় মণ্ডলী ও হলি ক্রস সংঘের শিক্ষা-সেবা ব্যহত হবে। হলি ক্রস সংঘ-সহ স্থানীয় মণ্ডলী এই অবদানের জন্য অনেক কৃতজ্ঞ। মণ্ডলীর যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীবৃন্দ ছাড়াও অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এই কলেজে পড়াশুনা করে বৃহত্তর সমাজে এবং খ্রিস্টমণ্ডলীতে নেতৃত্ব ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর জন্যও স্থানীয় মণ্ডলী হলি ক্রস সংঘ এবং নটর ডেম কলেজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

৭) স্থানীয় মণ্ডলীর একটি মিশন হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই ক্ষেত্রে নটর ডেম কলেজ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নটর ডেম কলেজ চার্চের একটি প্রতিষ্ঠান হলেও সেখানে সবার মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর সম্পর্ক। নটর ডেম কলেজের পরিচালনার ভার হলি ক্রস সংঘের ফাদারদের হাতে ন্যস্ত থাকলেও, পরিচালনায়, প্রশাসনে, শিক্ষকমণ্ডলীতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং আন্তঃধর্মীয় একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। এদিক থেকে নটর ডেম কলেজও একটি দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখে যাচ্ছে।

৮) নটর ডেম কলেজের সূচনা মুহূর্ত থেকে, পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এক মুহূর্তে হলি ক্রস সংঘ, কলেজের সহায়তায় ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র ছেলেরা কিছু আয় করে শিক্ষা ব্যয় ও হোস্টেল খরচ বহন করতে পারে। এই দিক থেকেও স্থানীয় মণ্ডলী নটর ডেম কলেজ দ্বারা বেশ উপকৃত হচ্ছে।

৯) পরিশেষে বলা যায় যে, বৃহত্তর দেশের জনগণের সেবার পাশাপাশি স্থানীয় মণ্ডলীকে বাংলাদেশের মাটিতে সুপ্রোথিত করতে, শিক্ষায় সম্পদশালী করতে, সেবাকর্মী গঠন করতে, শিক্ষিতদের নেতৃত্ব বৃদ্ধি করতে, বঞ্চিত মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে, ভাল শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে, দরিদ্রদের সেবা করতে, সব ধর্ম ও শ্রেণীর মানুষের সাথে মিলন সৃষ্টি করতে, খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ তুলে ধরতে, ... আরও কতো ভাবে, নটর ডেম কলেজ বিগত ৭৫ বছর ধরে বর্ণাতীত ও অসংখ্য অবদান রেখে যাচ্ছে তার জন্য হীরক জয়ন্তীতে স্থানীয় মণ্ডলী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

নটর ডেম কলেজের জন্য ভাবী স্বপ্ন

হীরক জয়ন্তী উৎসবে ভবিষ্যতের জন্য আমি দুটো স্বপ্ন তুলে ধরছি। প্রথম স্বপ্নটা হচ্ছে: নটর ডেম কলেজ যেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর নৈতিক গঠন আরও জোরদার করে এবং সকল গৃহীত পদক্ষেপের প্রত্যাশিত ফল উৎপাদনে নজর রাখে। দেশ গড়া, নেতৃত্ব দান ও সেবাকাজে নটরডেমিয়ানরা যেন কোন ভাবে দুর্নীতির দোষে দূষণীয় না হয়; দুর্নীতির কারণে তারা যেন প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত না হয়। দুর্নীতি দেশের উন্নয়নে বিরাট শত্রু। দুর্নীতির বিপরীতে চলতে হবে এবং সামর্থ অনুসারে তা ঠেকাতে হবে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন হচ্ছে: নটর ডেম কলেজ সবাইকে নিয়ে এমন একটি পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলবে যা হবে বৃহত্তর দেশ ও জাতি, এমন কি বিশ্বের একটি নিদর্শন স্বরূপ। এই বিশ্বে আমরা সবাই ভাইবোন, তা আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন, যে কৃষ্টি ও জাতিরই হই না কেন। নটর ডেম কলেজের পরিবারের মধ্যে এমন একটি কৃষ্টি গড়ে উঠবে যেখানে একটি ধর্ম বা কৃষ্টি বা জাতিগোষ্ঠির লোক অপরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের মানবব্যক্তি মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করবে। মানবিকতা ও মানবিক ভ্রাতৃত্বে গঠন হবে নটর ডেমের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি। মানব-ভ্রাতৃত্বের অভাবই প্রকাশ করছে আমাদের দেশ, সমাজ ও বিশ্বের মূল সমস্যা। নটর ডেম কলেজ পারবে আমার বিশ্বাস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে।

শুভেচ্ছা বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ সবসময় শুভ সুন্দর ও কল্যাণের পক্ষে কাজ করে চলেছে গত ৫০টি বছর। ১৯৭৪ খ্রীঃ ৭ জুলাই জন্মের পর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলা ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ আজ সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্রতা বিমোচন ও সৃজনশীল সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যয়ে রূপান্তরিক জীবনের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমার বিশ্বাস ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ সেবার কাজে আদর্শ ও চেতনায় উন্মোচিত হয়ে ঐতিহ্য প্রদর্শন গতিময় স্বকীয়তায় ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করে চলেছে। যুগে যুগে হাজার হাজার অসহায় মানুষ, সমাজের বঞ্চিত এবং প্রান্তিক মানুষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতি।

ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ শব্দটির মধ্যেই রয়ে গেছে এমনই একটি বৈশিষ্ট্য, যা' অনন্য। কেননা এর মূল শক্তি ঈশ্বরের আশীর্বাদ; একটি অবয়ব যাতে আছে নতুন ঐশ্বরীক আশীর্বাদ, অসহায় শিশুকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয়; যার মধ্যে আছে ঐশ্বরিক প্রেমের স্রোতস্বিনী, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে শক্তিময়, সেবার প্রবল উন্মাদনা, মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যগ্র, ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, প্রগতিশীল কাজে দীর্ঘায়ুর পথে, বিনয়ী উপস্থাপনা ও মহিমা বদান্যতায় অবিচল আস্থা। তাই আমি ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ এর মধ্যে ঈশ্বরের গৌরব উপলব্ধি করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, স্বপ্নদর্শী-দূরদর্শী স্বর্গীয় রেভাঃ স্মীথ আর. অধিকারী ও ড. রে. হেরিসনকে; যাদের অবদান আমরা ভুলবো না। নগর-মহানগরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের দেশের উন্নয়নে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় ভূমিকা রেখে চলেছে গত ৫০টি বছর। মাদার তেরেসা বলেছেন, *'আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি। প্রভু, আমাদের যোগ্য করো, যেন আমরা সারা পৃথিবীতে যেসব মানুষ দারিদ্রের মধ্যে, ক্ষুধার মধ্যে জীবনযাপন করেন, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের সেবা করতে পারি। কেবল সেবা নয়, মানুষকে দাও তোমার হৃদয়। হৃদয়হীন সেবা নয়, তারা চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ। আমাদের মধ্যে সবাই সব বড় কাজগুলো করতে পারে না, কিন্তু আমরা অনেক ছোট ছোট কাজ করতে পারি আমাদের ভালোবাসা দিয়ে। আনন্দই প্রার্থনা, আনন্দই শক্তি, আনন্দই ভালোবাসা।'*

আমার বিশ্বাস, প্রভুর গৌরব বহন করতে করতে কর্মের মধ্যদিয়ে সমাজের অসঙ্গতি ও দরিদ্রতার বৈষম্য দূর করতে সক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ হতদরিদ্র মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সফল। ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ এর সেবার কাজ অবলুপ্ত হবে না; সেবার আদর্শ বিরাজিত সর্বত্র, সর্বজনীন ও গতিময় শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই; এমনি আরো এগিয়ে চলার প্রত্যাশা সকলের। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে ইন্টারন্যাশনাল নিডস্ এর গৌরবোজ্জল ভূমিকা, আগামী দিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক, সেবার প্রত্যয়ে যুগ যুগ ধরে আয়ুবৃদ্ধি ঘটুক, অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ভরে উঠুক-এটাই কামনা করছি। আশীর্বাদান্তে,

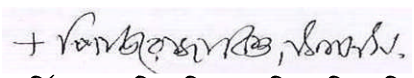

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
অবসরপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ

প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী = মণ্ডলীর ২০২৫ বর্ষপূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ-এর মূলভাব

খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিষ্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং "পাপের পূর্ণদণ্ডমোচন"। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পলের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর "পুণ্য দ্বার" উম্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় প্রত্যাশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রত্যাশাই পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ" (১২:২)।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলীর জন্য যে মূলভাব বেছে নিয়েছেন তা হল: "প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী"। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "যে আশা আমরা দান রূপে পেয়েছি তা উজ্জীবিত করতে হবে, নতুন শক্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য অপরকে সাহায্য করতে হবে, যেন তারা ভবিষ্যতের দিকে উম্মুক্ত চিত্তে তাকাতে পারে, তারা যেন পেতে পারে ভরসাপূর্ণ হৃদয় ও দুরদর্শী দর্শন। আসছে জুবিলী প্রত্যাশার একটি

পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, নবায়ন ও নব জন্মের জন্য ভরসা জাগাতে পারে, যা আমরা কতো জরুরিভাবে বাসনা করছি। এ কারণে আমি জুবিলীর মটো হিসেবে বেছে নিয়েছিঃ “প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী” (বা “প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী”)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমাণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্ব খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই প্রসঙ্গে বলেনঃ “জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্তি যতোই এগিয়ে আসছে ততোই আমরা আহ্বান পাচ্ছি প্রস্তুতি-পর্বে প্রবেশ করতে যেন খ্রিষ্টান জনগণ পুণ্যবর্ষের পালকীয় বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।”

২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষঃ উৎসর্গ করা হবে প্রার্থনা-বর্ষ হিসেবে। প্রার্থনার ব্যপারে পোপ মহোদয় একটি চিঠিতে উল্লেখ করে বলেন যে, “প্রার্থনা সর্ব্বোপরি যেন এক মহান “ঐকতান” রূপে প্রতিধ্বনিত হয়; প্রভুর সামনে অবস্থান করার বাসনাকে নবায়িত করে, তাঁর বাণী শুনতে এবং তাঁর আরাধনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। উপরন্তু, প্রার্থনা যেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সকল ভালবাসার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং সকল সৃষ্টিকাজের জন্য প্রশংসা করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রার্থনা পবিত্রতা লাভের রাজকীয় পথ। কর্মযজ্ঞের মধ্যে ধ্যানী হতে আমাদের সক্ষম করে। সংক্ষেপে, প্রার্থনা যেন বর্ষকালীন প্রার্থনার গভীরে নিয়ে যায় যেখানে আমাদের হৃদয় উম্মুক্ত করে যাতে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বর্ষিত অনুগ্রহ ধারা প্রবাহিত হতে পারে, যাতে যিশুর শেখানো “প্রভুর প্রার্থনা” যিশুর প্রত্যেক শিষ্যের

জীবনযাপনের কমসূচি হয়ে ওঠে" (জুবিলী উপলক্ষে পরিপত্র, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি.)

২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষঃ রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদযাপন করবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ড্রিরোজারিও, সিএসসি
জানুয়ারি ১৯, ২০২৪ খ্রি.

"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক"-এর প্রধান, কার্ডিনাল রিনো ফিসিচেল্লা'র উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত - ২০/০৯/২০২২)

প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী

মণ্ডলীর ২০২৫ বর্ষপূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ-এর মূলভাব

খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিষ্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং "পাপের পূর্ণদণ্ডমোচন"। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পলের সময় পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর "পুণ্য দ্বার" উন্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলী হবে সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় *প্রত্যাশা* জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রত্যাশাই পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ" (১২:২)।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলীর জন্য যে মূলভাব বেছে নিয়েছেন তা হল: **"প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী"**। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "যে আশা আমরা দান রূপে পেয়েছি তা উজ্জীবিত করতে হবে, নতুন শক্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য অপরকে সাহায্য করতে হবে, যেন তারা ভবিষ্যতের দিকে উন্মুক্ত চিত্তে তাকাতে পারে, তারা যেন পেতে পারে ভরসাপূর্ণ হৃদয় ও দুরদর্শী দর্শন। আসছে জুবিলী প্রত্যাশার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে,

নবায়ন ও নব জন্মের জন্য ভরসা জাগাতে পারে, যা আমরা কতো জরুরিভাবে বাসনা করছি। এ কারণে আমি জুবিলীর মটো হিসেবে বেছে নিয়েছি: **'প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী'** (বা "প্রত্যাশী তীর্থযাত্রী"।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমাণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এই প্রসঙ্গে বলেন: "জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্তি যতোই এগিয়ে আসছে ততোই আমরা আহ্বান পাচ্ছি প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করতে যেন খ্রিষ্টান জনগণ পুণ্যবর্ষের পালকীয় বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।"

২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষ: উৎসর্গ করা হবে প্রার্থনা-বর্ষ হিসেবে। প্রার্থনার ব্যপারে পোপ মহোদয় একটি চিঠিতে উল্লেখ করে বলেন যে, "প্রার্থনা সর্ব্বোপরি যেন এক মহান "ঐকতান" রূপে প্রতিধ্বনিত হয়; প্রভুর সামনে অবস্থান করার বাসনাকে নবায়িত করে, তাঁর বাণী শুনতে এবং তাঁর আরাধনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। উপরন্তু, প্রার্থনা যেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সকল ভালবাসার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং সকল সৃষ্টিকাজের জন্য প্রশংসা করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রার্থনা পবিত্রতা লাভের রাজকীয় পথ; কর্মযজ্ঞের মধ্যে ধ্যানী হতে আমাদের সক্ষম করে। সংক্ষেপে, প্রার্থনা যেন বর্ষকালীন প্রার্থনার গভীরে নিয়ে যায় যেখানে আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে যাতে আমরা ঈশ্বরের বর্ষিত অনুগ্রহ ধারা প্রবাহিত হতে পারে যাতে যিশুর শেখানো "প্রভুর প্রার্থনা" যিশুর প্রত্যেক শিষ্যের জীবনযাপনের কমসূচি হয়ে ওঠে" (জুবিলী উপলক্ষে পরিপত্র", ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি.)

২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ: রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
জানুয়ারি ১৯, ২০২৪ খ্রি.

"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক"-এর প্রধান, কার্ডিনাল রিনো ফিসিচেল্লা'র উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত - ২০/০৯/২০২২)